রকমারি

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, এম-এ, বি-এল্, ডি-লিট্

প্রণীত।

১ম সংস্করণ

১৯৩১

মূল্য ।৷০ আনা মাত্র।

প্রকাশক—
কাজী আবদুর রশীদ, বি-এ,
প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী,
ভিক্টোরিয়া পার্ক, ঢাকা।

প্রিণ্টার—
কাজী আবদুল অহিদ,
প্রভিন্সিয়াল মেশিন প্রেস,
নারিন্দিয়া রোড, ঢাকা

মুখবন্ধ

এর প্রায় সব গল্পই আগে নানান্ কাগজে বেরিয়ে গিয়েছে। আজ এক জায়গায় ক'রে সকলের সাম্‌নে ধর্‌লুম। যদি কারও ভাল লাগে, আমার কলম ধন্য হবে। ইতি

রমণা, ঢাকা
১১।১০।৩১ ইং।

গ্রন্থকার

সূচী

লা পারিযিয়েন

(১)

রশীদ মেধাবী ছাত্র। বরাবর বৃত্তি পেয়েছে। কাজেই পিতার উপর সে পড়াশুনার খরচের বড় একটা ভাব চাপায় নি। এবার সে বি. এ. পরীক্ষায় ইংরেজিতে অনার পেয়ে প্রথম বিভাগে প্রথম হ'য়েছে। বাপের বুক আনন্দে গর্ব্বে ফুলে উঠেছে।

রশীদের—পিতা কোন স্কুলের হেড মৌলভী। সামান্য আয়। অনেকগুলি ছেলে মেয়ে। কিন্তু রশীদের পড়ার খরচের জন্য কখন তাঁকে ভাব্‌তে হয় নি। এবার তিনি একটু ভাব্‌ছেন। ছেলেটাকে কোনও রকমে বিলেতে পাঠাতে পার্‌লে মানুষ হ'ত।

খোদাই মুশ্‌কিল আসান ক'রে দেন। সুবর্ণপুরের জমিদার বাড়ী থেকে রশীদের বিয়ের প্রস্তাব এল। তাঁরা এমন ভরসাও দিলেন যে বিলেতের খরচ পর্য্যন্ত দিবেন। সেই বৎসর শওয়াল মাসের এক শুভ দিনে খুব ধুমধামে সালেহা খাতুনের সঙ্গে রশীদের শাদী মোবারকবাদী হ'য়ে গেল।

সে বৎসর কিন্তু রশীদের বিলেতে যাওয়া হ'ল না। শ্বশুর সাহেব বল্‌লেন এম. এ. পাশ ক'রে বিলেতে যাওয়া ভাল। রশীদের পিতা বেহাইয়ের কথায় একটু অসন্তুষ্ট হ'লেন। রশীদ বিলেতে যেতে খুব উৎসুক ছিল, তবুও সে মনে মনে খুশীই হ'ল। তেমন অবস্থায় পড়্‌লে তোমরাও রশীদের মতন ক'র্ত্তে।

রশীদ এম. এ. পাশ কর্‌লে প্রথম বিভাগে বটে, কিন্তু সকলের নীচে হ'য়ে। রশীদের পিতা মৌলভী সাহেব সকলের কাছে ব'ল্লেন যে পরীক্ষকেরা পক্ষপাতিত্ব ক'রেছে; তা না হ'লে তাঁর ছেলে যেমন তেমন ছেলে নয়। রশীদ কিন্তু ভালই জান্‌ত এরূপ পরীক্ষার ফলের কারণটা কি।

(২)

আজ রশীদের বিলেতে যাত্রার দিন। সালেহার মুখ খানি শ্রাবণের মেঘলা দিনের মত আঁধার। এক বছুরে

কোলের ছেলে আবু মায়ের আদর না পেয়ে বার বার চীৎকার ক'রে কাঁদ্‌ছে। কিন্তু সালেহার সে দিকে লক্ষ্য নেই। রশীদ জিনিস পত্র গোছাতে খুবই ব্যস্ত।

বিদায়ের সময় সালেহার বুক ফেটে যাচ্ছিল। কিন্তু তার মুখে কথাটী নেই। কত কথা বল্‌বে ব'লে বেচারী সমস্ত রাত মনে তোলাপাড়া ক'রেছে। এখন কিন্তু বার বার চেষ্টা ক'রেও মুখে কথা ফুটল না। সে অনেক কষ্টে শুধু এই টুকু ব'ল্‌লে, "আবুকে ভুলো না।" রশীদ কি বল্‌তে যাচ্ছিল, এমন সময় বাপ এসে দোরের পাশ থেকে চেঁচিয়ে ব'ল্লেন, "বাবা রশীদ, ট্রেন যে ফেল হ'য়ে যাবে। এস বাবা, জল্‌দি এস।" তাড়াতাড়ি রশীদ স্ত্রী পুত্রের মুখে দুটো চুমো দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়্‌ল। ছেলেটা আঁত্‌কে কেঁদে উঠ্‌ল। কিন্তু সে দিকে রশীদের মন দেবার সময় ছিল না।

(৩)

অক্সফোর্ড—ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ড। তার সঙ্গে ইংরেজ জাতির কত শতাব্দীর কত মনীষীর স্মৃতিই না জড়িয়ে আছে! এখন রশীদ সেই অক্‌সফোর্ডের সেণ্টজন্‌স্ কলেজের ছাত্র। তার কৈশোরের স্বপ্ন আজ এক অংশে সফল।

রশীদ খুব মন দিয়েই প'ড়্ছে ; বাজে কাজে সময় একটুকুও নস্ট করে না। অবসর সময় সে একটু ফরাসী ভাষা শেখে। বস্তুতঃ সে পুস্তক-জগতেই বাস করে। তার বন্ধুরা তাকে "হোপলেস কেস" মনে ক'রে তার আশা ছেড়ে দিয়েছে। প্রথমে তারা তাকে মদ ধরাবার জন্য খুব উঠে প'ড়ে লেগে গিয়েছিল। কিন্তু শেষে হা'র মেনে তারা একে একে স'রে প'ড়েছে। রশীদ এখন নির্বিঘ্নে পড়ার ভিতরই ডুবে আছে।

তবু তাকে সপ্তাহে দুদিন কয়েক ঘণ্টা সময় নষ্ট কর্‌তে হয়। যে দিন দেশ থেকে মেল আসে, সে দিন কতকটা সময় চিঠি পত্র পড়্‌তে যায়। আর যে দিন মেল ছাড়ে, সে দিনও কয়েক ঘণ্টা পত্র লিখ্‌তে যায়। বাড়ীর চিঠির মধ্যে যেখানে ছেলের কথা লেখা থাকে,—এই আবু হাঁটতে শিখেছে, এই আবু আকাশের চাঁদের দিকে চেয়ে 'বাবু, আয়' 'বাবু, আয়' ক'রে ডাকে—এমন সব লেখা তার মনে কি এক ভাব এনে দেয়। এই দু দিন ছাড়া রশীদ সমস্ত দুনিয়া ভুলে পড়াশোনায় মশ্‌গুল হ'য়ে থাকে।

গ্রীষ্মের বন্ধে অক্‌সফোর্ড একরূপ জনশূন্য। কলেজের ছেলেরা ছুটি পেয়ে চারি দিকে ছুটে বেরিয়েছে। বন্ধে কলেজে থাক্‌বার হুকুম নেই। তবুও রশীদ একটা

ফ্যামিলিতে থাকবে ব'লে স্থির ক'রেছিল। কিন্তু কয়েকজন ভারতীয় ছাত্র এসে তাকে পাকড়াও করলে প্যারিসে বেড়াতে যেতে হবে। ফরাসী ভাষার একটু চর্চ্চা হবে মনে ক'রে সেও রাজী হ'য়ে গেল।

(৪)

সুন্দরী নগরীরাণী প্যারী। কোন পারসী কবি কাশ্মীর সম্বন্ধে যা ব'লে গেছেন, প্যারিস সম্বন্ধে তা বলা যেতে পারে—

"গর্ ফির্দৌস বরূএ যমীনস্ত।
হমীনস্ত হমীনস্ত হমীনস্ত॥"

"যদি মর্ত্ত্যে স্বর্গ থাকে, তবে সে এই, সে এই, সে এই।" গ্যার দে নোর ষ্টেশনে নেমে রশীদের চোখে প্যারিস এমনই সুষমাময়ী দেখালে। একখানি ট্যাক্সিতে ক'রে সে আর তার দুই সঙ্গী র‍্যু দ্যু সোমেরারের একটা হোটেলে গিয়ে উঠ্‌ল। আগেই তাদের প্যারিসের বন্ধুরা এখানে তাদের জন্য কামরা ঠিক ক'রে রেখেছিল।

দিন পনর পরে রশীদের সঙ্গীরা সুইযার্‌ল্যাণ্ডে বেড়া'তে গেল। তারা রশীদকে খুব টানাটানি ক'রলে, কিন্তু সে প্যারিস ছেড়ে যেতে চাইলে না। বাস্তবিক ফরাসী ভাষা, ফরাসী জাতি, আর ফরাসী রান্না রশীদকে একেবারে মোহিত ক'রে ফেলেছিল। কাজেই সে

প্যারিসেই সমস্ত বন্ধটা কাটাতে ইচ্ছা ক'র্লে। সঙ্গে কতকগুলো কলেজের পড়ার বইও ছিল; কাজেই সময় নষ্ট হবার ভয় ছিল না।

রশীদ মাস খানেক প্যারিসে আছে। কয়েকটী ভারতীয় ছাত্র তাকে প্যারিসের জীবন দেখাতে প্রথম দিন কতক তার পিছু খুব ঘুরেছিল; কিন্তু শেষে তাকে নিতান্ত বদ্‌রসিক জেনে সঙ্গ ছেড়ে দিলে। রশীদ একাই খায় দায় আর পড়ার অবসর সময়ে একাই বেড়ায়।

আগষ্ট মাস। তখন প্যারিসে সূর্য্যাস্ত ৯টার কাছা-কাছি। ৭টার সময় ডিনার খেয়েও অনেকটা বেলা থাকে। এই সময় রশীদের বেড়ানোর সময়। সে দিন রবিবার। বিকেল ৮ টার সময় রশীদ লুক্‌সেমবুর্গ উদ্যানের একটা বেঞ্চেতে ব'সে পুকুরে ছেলেমেয়েদের খেলনার ছোট ছোট পা'লের জাহাজ ভাসান দেখ্‌ছিল। পুকুরের তরঙ্গের মত তার মনেও কত তরঙ্গ উঠ্‌ছিল!

তার পাশে কখন যে একটী কিশোরী এসে ব'সেছিল, তা সে টের পায় নি। কিশোরীটী যে তার স্নিগ্ধ শ্যামল মুখখানির দিকে বার বার কৌতূহলের সঙ্গে তাকাচ্ছিল, তাও সে জান্‌তে পারে নি। তার চমক ভেঙে গেল তখন, যখন সে একটা মৃদু মধুর কণ্ঠস্বর শুন্‌লে—"এক্‌সকুাযে মোয়া, মসিয়ে, ভুযেত দে কেল্ ন্যাসিও-

নালিতে ?" (ক্ষমা করুন, মশা'য়, আপনি কোন্ জাতি ?) রশীদ একটু মুচ্‌কে হেসে ব'ল্‌লে, "সান্ ফে রিয়ঁ্যা, মাদ্‌মোয়াযেল্, মোয়া যে স্যুই অঁ্যাদ্যু।" (সে কিছু নয়, কুমারী, আমি ভারতবাসী)। বলা বাহুল্য রশীদ এখন কাজ চালান গোছ ফরাসী শিখে ফেলেছে। তখন যে কথাবার্ত্তা হ'ল তার সারমর্ম্ম হ'চ্ছে—মেয়েটী একটা দোকানে কাজ করে। সে ভারতবর্ষকে খুব ভালবাসে। তার পিতা চন্দননগরে কিছু দিন চাকরি ক'রেছিল। আজ কয়েক বৎসর হ'ল তিনি মারা গেছেন। মেয়েটী রশীদের নাম, রশীদ যে অক্সফোর্ডে পড়ে, বন্ধে কয়েক দিনের জন্য প্যারিসে বেড়াতে এসেছে ইত্যাদি খবরও কথা প্রসঙ্গে বা'র ক'রে নিলে। শেষে সে তার নিজের কার্ডখানা রশীদকে দিলে। কিন্তু রশীদ একটা ওজর ক'রে তার কার্ডখানা মেয়েটীকে দিলে না। হোটেলের ঠিকানা সে বড় একটা কাকে দিত না। একবার দিয়ে সে একটু ঝঞ্ঝাটে প'ড়ে ছিল। সেই থেকে সে সাবধান হ'য়ে গেছে। সন্ধ্যা হ'য়ে এল দেখে সে তাড়াতাড়ি "ও রেভোয়ার, মাদ্‌মোয়াযেল্" (বিদায়, কুমারী) ব'লে বাসার দিকে চল্‌ল।

আর একদিন রশীদ একটা রেস্তোরাঁয় "দেয্যোনে" (ইংরেজিতে লঞ্চ) খেতে বসেছে, একটা মেয়ে এসে তার

কাছের একটী টেবিলে ব'সল। রশীদ একটা কট্‌লেটের সদ্ব্যবহার কচ্ছিল ; অন্য দিকে তার লক্ষ্য ছিল না। মেয়েটী এদিকে ওদিকে চেয়ে রশীদকে দেখেই তার সামনের চেয়ারে এসে ব'সে বল্‌লে, "বঁ যূর্‌, মসিয়ে রশীদ, ভুযালে বিয়াঁ ?" (সুদিন, রশীদ সাহেব, আপনি ভাল আছেন ?) রশীদ একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে গেল। এ কে যে তার নাম জানে ? তখনি তার সব কথা মনে হ'তে সে হেসে ব'ল্‌লে "বঁ যূর্‌, মাদ্‌মোয়াযেল্‌, ম্যার্সি, ত্রে বিয়াঁ, এ ভূ ?" (সুদিন, কুমারী, ধন্যবাদ, খুব ভালই ; এবং আপনি কেমন ?) রশীদ প্রথমে ভুলে গিয়েছিল যে লুক্‌সেমবুর্গ বাগানে এক দিন এই মেয়েটার সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় হ'য়েছে এবং তার কার্ড থেকে সে জেনেছে যে তার নাম সুযান্‌।

খেতে খেতে অনেক কথা হ'ল। মেয়েটা কথায় কথায় প্রস্তাব কর্‌লে যে সে রশীদের কাছে ইংরেজি পড়্‌তে চায় আর তার বদলে তাকে ফরাসী পড়াবে। রশীদ তা'তে অসম্মত হ'তে পার্‌লে না। আজ সে তার হোটেলের ঠিকানা লেখা সমেত একটী কার্ডও মেয়েটীকে দিয়ে ফেল্লে।

তার পর থেকে পড়ান ও পড়া খুব উৎসাহের সঙ্গেই চল্‌তে লাগ্‌ল। প্যারিসে ছুটি শেষ ক'রে রশীদ কলেজ খোলার আগের দিন অক্সফোর্ডে ফির্‌ল।

(৫)

পরের বড় দিনের বন্ধেও রশীদ প্যারিসে গেল। আবার ইস্টারের বন্ধেও সে প্যারিসে গেল। এবার কয়েক জন বন্ধু তাকে জর্ম্মানিতে নিয়ে যেতে খুব টানাটানি ক'রেছিল। তবুও রশীদ প্যারিসেই গেল। ফিরে এলে তার বন্ধুরা তার ফরাসী-প্রীতি দেখে তাকে "মসিয়ে ফ্রাঁসে" ব'লে ডাক্‌তে লাগ্‌ল।

সে বৎসর গ্রীষ্মের বন্ধে কলেজের বন্ধুরা স্কটল্যাণ্ডে বেড়াতে যাবে ব'লে ঠিক করলে। কিন্তু কলেজ বন্ধ হ'তেই রশীদ কাউকে কিছু না বলেই চুপে চুপে প্যারিসে রওনা হ'য়ে গেল।

প্যারিসের এতোয়াল অঞ্চলে সে একটা হোটেলে কামরা নিলে। আগে আরও দুবার সে সেখানেই এসে থেকে গিয়েছে। সুযানও সেই হোটেলে থাকে। র্যু দ্যু সোমেরারের কয়েক জন ভারতীয় ছাত্র তা'কে প্রথম বারে বড় অপদস্থ ক'রেছিল ব'লে সে ক্যার্তিয়ে লাত্যাঁ ছেড়ে দিয়েছে।

প্রেম স্বর্গীয়। সে প্রেমকে নিন্দা করতে পারে কে? রশীদ মনে করলে সুযানের প্রতি তার ভালবাসাও স্বর্গীয় ভালবাসা। তা'তে দোষ কি? সে ত আর তার স্ত্রীর সঙ্গে অবিশ্বাসী হ'চ্ছে না! হায় মোহ!

যদি সালেহা আর একজন পুরুষকে ঐ রকম স্বর্গীয় ভালবাসা দিত, তবে রশীদের মনে কেমন হ'ত! কিন্তু রশীদ সে কথা মনে ভাব্‌তে পারে নি।

(৬)

প্যারিসে একটী প্রকাণ্ড সুন্দর মস্‌জিদ আছে। সেটী মগরেবী স্‌টাইলে তৈরী। তার উচ্চ চউকোণা মিনার দূর থেকে পথিকের নজরে পড়ে। রশীদ আজ এই মসজিদে ব'সে আছে। রশীদ বিলেত গিয়ে প্রথম প্রথম কয়েক দিন নমায প'ড়েছিল। তারপর নানা অসুবিধায় সে নমায ছেড়ে দিয়েছে। অনেক দিন সে খোদার কাছে মাথা নোঁয়ায় নি। আজ শুক্রবার সে তার সবচেয়ে ভাল সূট প'রে তার উপর ফেয চড়িয়ে প্যারিসের মসজিদে নমায পড়্‌তে গিয়েছে। জুমার নমাযের পরে সকলে চ'লে গেল। কেবল রশীদ এবং ইমাম সাহেব মস্‌জিদে রইলেন। রশীদ আজ হঠাৎ এমন ভক্ত হ'য়ে গেল কোথা থেকে— তোমরা অবশ্য জিজ্ঞাসা ক'র্‌বে। কিন্তু সবুর!

সেকণ্ডের কাঁটা যত টিক্ টিক্ ক'রে মিনিট গুণে যাচ্ছে, ততই রশীদের হৃদয় আগ্রহে ধুক্ ধুক্ কর্‌ছে। ক্রমে কাঁটার শব্দ তার কাছে ঘণ্টার আওয়াজের মত বোধ হ'তে লাগ্‌ল। কেউ মর্‌লে যেমন গির্জায় ঘণ্টা

বাজে, এ বাজনা যেন তেমনি। কতবার সালেহার বিদায় কালের বিষাদমাখা মুখখানা মনে হ'ল! কত-বার ছেলের সরল মুখখানা মনের চোখে ভেসে উঠ্‌ল! কিন্তু রশীদ বারবার ঘড়ীর দিকে তাকাচ্ছে। যখন তিনটে বাজ্‌তে ১৫ মিনিট আছে, তখন রশীদ ইমাম সাহেবকে ব'লে মসজিদের গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

ঠিক তিনটের সময় রশীদের হোটেলের "গার্‌স" এসে তার হাতে এক খানি পত্র দিয়ে বিদায় হ'য়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি পত্রখানা খুলে প'ড়্‌তে লাগ্‌ল! পত্রখানা সুযানের লেখা। সন তারীখ স্থান বাদ দিয়ে পত্র খানির তর্জ্জমা এই—

"আমার প্রিয় রশীদ,

ঠিক তিনটের সময় আমার বদলে আমার একখানা পত্র পেয়ে তোমার মনে কি ভাব হবে তা জানি নে। বোধ হয় তুমি খুব বিরক্ত হবে। কথা ছিল তুমি মসজিদের ইমামের সাম্‌নে তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে আমাকে বিয়ে কর্‌বে। ভেবে দেখলুম সেটা তোমার খুব অন্যায় হবে। তুমি মনে ক'রো না যে আমি তোমাকে ভালবাসি না; খুব ভালবাসি, প্রাণের মত ভালবাসি। কিন্তু আমি আমার দেশকে তোমার চেয়ে বেশী ভালবাসি। আমি খুব চিন্তা ক'রে

দেখ্‌লুম আমি এই সুন্দরী ফরাসী ভূমি ছেড়ে তোমাদের দেশে মশা, বাঘ আর সাপের সঙ্গে কিছুতেই বাস ক'র্‌তে পার্‌ব না। এসব আগেই ভাবা আমার উচিত ছিল। কিন্তু এখনও একেবারে বেশী দেরী হয় নি। নানা কাজে থাকি, বেশী আগে ভাববার সময় কোথায়? তবে তোমার মনে হয় ত নৈরাশ্যের কষ্ট দিলুম। তার জন্য দশ শ'বার তোমার ক্ষমা চাই। আমি এই হোটেল ছেড়ে চল্‌লুম। হয় ত কখন দেখা হ'তেও পারে। তবে বিদায়, বন্ধু, বিদায়।

বিশ্বাস ক'রো, আমার প্রিয়, আমি তোমার একান্ত অনুরাগিণী

সুষান্।"

পত্রখানা একবার শেষ ক'রে, রশীদ আর একবার সেখানা পড়্‌লে। তার পর একটা বড় রকমের দীর্ঘ শ্বাস ফেলে, কাছে বাজপড়া লোকের মত সেখানেই দাঁড়িয়ে র'ইল।

ইমাম সাহেব যখন এসে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "কি হ'ল?" তখন রশীদের হুঁশ হ'ল। সে স্থিরভাবে বল্‌লে "আল্ হামদু লিল্লাহ্।" আল্লাহ্‌তা'লা আমায় উদ্ধার ক'রেছেন।

সেই দিনই সে সীন নদীতে তার ফরাসী বইগুলি বিসর্জ্জন দিয়ে লণ্ডনে এল।

এর পর আর কেউ রশীদকে কখনও ফরাসীর নাম মুখে আনতে শুনে নি।

বিলাত-ফেরত

(১)

খান বাহাদুর খোন্দকার সমীরুদ্দীন বনিয়াদি জমিদার। লোকটী চমৎকার। সকলকে সন্তুষ্ট রাখ্‌তে তিনি খুব পটু। রাজপুরুষদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা, তাঁদের পার্টি দেওয়া, এ সবও তিনি যেমন করেন, আবার তেমনি কংগ্রেসেও চাঁদা দেন (যদিও একটু গোপনে) এবং মধ্যে মধ্যে খদ্দরও পরেন। গ্রামে তিনি একটী উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন, এদিকে তাঁদের সাবেক মস্‌জিদের সঙ্গে একটী জুনিয়ার মাদ্রাসাও কায়েম ক'রেছেন।

তাঁর এক মেয়ে, এক ছেলে। মেয়েটী বড়। তার উপযুক্ত খান্দানি ঘরেই বিয়ে হ'য়েছে। ছেলে আবদুল মজীদ ইংরাজী স্কুলেই পড়ে। তবে রোজ সকালে মাদ্রাসার মৌলভী সাহেব এসে তাকে কোর্‌আন শরীফ ও মস্‌লা মাসাএল শেখান। খান বাহাদুর সাহেব নিজে শরা শরি'অতের খুব "পাবন্দ"। ছেলের উপরও কড়া হুকুম আছে; নমায না পড়্‌লে প্রহার, রোযা না রাখ্‌লে খানা বন্ধ। মজীদ যখন ক্লাস টেনে পড়ে, তখন একদিন তার নবীন দাড়ী গোঁফ কামিয়েছিল। আর যায় কোথা! খান বাহাদুর সাহেব তাকে ব'কে বাড়ীর বা'র ক'রে দিয়েছিলেন। অনেক কান্না কাটির পর তওবা ক'রে তবে সে বাড়ীতে ঢুক্‌তে পেরেছিল।

এই টুকু শুনেই আপনারা মনে ক'র্‌বেন না খান বাহাদুর সাহেব গোঁড়া মুসলমান। তাঁর জমিদারির অধিকাংশ নায়েব গোমশ্‌তা হিন্দু। তাঁরা কাছারি বাড়ীতে বছর বছর কালী পূজা করেন, তা'তে তিনি বাধা দেন না। একবার এক গোঁড়া মৌলভী তাঁর কাছে এসে আপত্তি জানালে তিনি কোর্‌আন শরীফের আয়ত প'ড়ে ব'লেছিলেন—"তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম্ম" এই ত কাফেরদের উপর খোদার হুকুম।

(২)

মজীদ এখন কলেজে পড়ে। পাছে শহরে এসে ছেলে খারাপ হ'য়ে যায়, এজন্য খান বাহাদুর সাহেব তাঁদের ক'ল্‌কাতার বাড়ীতেই থাকেন। বন্ধের সময় ছেলেকে নিয়ে তিনি গ্রামে যান। তাঁর অভাবে গ্রামের শ্রী অনেকটা নষ্ট হ'য়ে গেছে। কিন্তু কি করা যায় ? ছেলেকে ত মানুষ করা চাই।

কলেজে মজীদ পড়া শোনা ক'রে মন্দ নয়। কিন্তু তার কচিমুখে লম্বা দাড়ী তাকে তার সহাধ্যায়ীদের কাছে বড় জ্বালাতনে ফেল্‌ত। একটী রসিক ছেলে তার দাড়ীর উপর একটা সনেট লিখে ফেলেছিল। তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে সেটা পড়া হ'ত। কিন্তু মজীদের কোন উপায় ছিল না। সে কখনও শিক্ষকদের কাছে নালিশ কর্‌তে চাইত না; আর দাড়ী কামানোরও যো ছিল না। এক দিকে ক্লাসে একেবারে একঘরে হওয়া, অন্যদিকে বাপের তিরস্কার। দুই-ই সে ভয় ক'র্‌ত। যাক্ সে কথা; মজীদ ক্রমে বি-এ পাশ কর্‌লে।

(৩)

বন্ধু-বান্ধবদের পরামর্শে মজীদকে বিলেতে ব্যারি-ষ্টারি পড়াবার জন্য খান বাহাদুর সাহেব স্থির ক'রলেন। পাছে বিদেশে ছেলে বিগ্‌ড়ে যায়—এ

আশঙ্কা যে তাঁর মনে হয় নি, তা নয়। তবে তিনি মনে ক'রেছিলেন আজকালকার দিনে এ সমস্ত না হ'লে আর মান সম্ভ্রম থাকে না। তার পর ছেলেকে যেমন ক'রে তিনি শরি'অতে পাকা ক'রে তুলেছেন, তাতে তার বিগ্ড়ান সম্ভবপর নয়।

বোম্বাই পর্য্যন্ত গিয়ে খান বাহাদুর সাহেব ছেলেকে জাহাজে তুলে দিলেন। সঙ্গে জায়নমায, তস্বীহ্ ও কোর্আন শরীফ দিতে ভুললেন না। বিদায় কালে নানা নসীহত ক'রে পানিভরা চোখে দো'আ ক'রে তীরে চ'লে এলেন।

যে পর্য্যন্ত জাহাজ নজরের বা'র না হ'য়ে যায়, খান বাহাদুর সাহেব জেটিতে দাঁড়িয়ে রইলেন। মজীদও ডেকের উপর রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ পিতার দিকে চেয়ে রইল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেবিনে গিয়ে শুয়ে প'ড়্ল। শুয়ে শুয়ে নানা কথাই তার মনে হ'তে লাগ্ল। সে রাত্রে তার আর কিছু খেতে ইচ্ছা ছিল না।

(৪)

পর দিন সকালে ব্রেকফাস্টের সময় টেবিলে সে একটু অপ্রস্তুত হ'ল। সে গিয়েছিল আচকান পায়জামা তুর্কি টুপী প'রে খেতে। সে সাহেবদের মাঝে ব'সে প'ড়েছিল।

হেড স্টুয়ার্ড এসে তাকে অন্যান্য নেটিব লোকদের সঙ্গে ব'সিয়ে দিলে। সে জন্মে ছুরি কাঁটা ব্যবহার করে নি। সঙ্গীদের অনেকেরই সেই দশা। তবে কালো চামড়া সব সেখানে। যে একটু সাহেবী খানা খেতে অভ্যস্ত ছিল, সে খুব মুরুব্বিয়ানা ক'রে আনাড়ীদের দোষ সুধ্‌রে দিলে।

সেই দিন বিকেলেই মজীদ বহু দিনের দাড়ীটার মূলোচ্ছেদ ক'রে আরব সাগরের নীল জলে বিসর্জ্জন দিয়ে যেন একটা প্রকাণ্ড বোঝার হাত থেকে রেহাই পেলে। কেবিনের বড় আয়নায় মুখ দেখে তার নিজেরই মনে হ'ল কি সুন্দর চেহারাটা তার দাড়ীটার জন্য একেবারে মাটী হ'য়ে গিয়েছিল! কলেজে দাড়ীর গঞ্জনার কথাও মনে উঠ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে দাড়ীভক্ত পিতার উপর তার মনটা যেন কেমন বিগ্‌ড়ে গেল।

বাপের ভয়ে মজীদ কখন গান বাজনায় যোগ দিতে পারে নি। থিয়েটার বায়োস্কোপের ত নামটী পর্য্যন্ত মুখে আনবার যো ছিল না। জাহাজের ড্রয়িং রুমে সুন্দরীদের পিয়ানোর টুংটুং আওয়াজে তার প্রাণে কত ভাবের ঢেউ খেল্‌তে লাগ্‌ল। যুবকযুবতীদের বুকোবুকি মুখোমুখি বল নাচ দেখে তার নিজেকে সামলান যেন দায় হ'য়ে উঠ্‌ল। জাহাজ লোহিত সাগরে পৌঁছুতে না পৌঁছুতে মজীদ পোশাক পরিচ্ছদে একেবারে পাক্কা সাহেব।

(৫)

মজীদ লণ্ডনে ব্যারিষ্টারি পড়্‌ছে। প্রতি সপ্তাহে বাড়ীতে পত্র লেখে। মাস গেলেই ত্রিশ পাউণ্ড খরচা পায়। অত টাকা কিছু থাকা খাওয়া ও পড়ার খরচায় ব্যয় হয় না। কাজেই আমার মত অরসিক হয় ত যাকে অপব্যয় বল্‌বে, তাতে বেশ খরচ হ'তে লাগ্‌ল। কোন কোন মাসে কিছু ধারও হ'তে লাগ্‌ল। নানা অজুহাতে সে বাড়ী থেকে উপরি টাকা চেয়ে পাঠাত। কোন মাসে অমুক বড় সাহেবকে ভোজ দিতে হবে; কোন মাসে অসুখের জন্য ডাক্তারের খরচ দিতে হবে; এই রকম কত কিছু। খান বাহাদুর সাহেব পাছে ছেলের অসুবিধা হয়, এই জন্য অসঙ্কোচে টাকা পাঠিয়ে দিতেন।

আমি একবার কোন বিষয় উপলক্ষে খান বাহাদুর সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেম। তিনি যখন মজীদের কথা তুল্‌লেন, তখন তাঁর আর কথা ফুরায় না। আমার তখন কোল্‌রিজের বুড়ো খালাসীর কথা কেবল মনে হ'চ্ছিল। তাঁর কথার সার মর্ম্ম এই যে মজীদ খুব "নেকবখ্‌ত" ছেলে আর ব্যারিষ্টারি পড়ান যে সে লোকের কর্ম্ম নয়।

(৬)

মানুষের চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর এক জনের চাওয়া আছে। তাঁর চাওয়ার বিরুদ্ধে মানুষের চাওয়া নায়াগ্রার

স্রোতের বিরুদ্ধে পিঁপড়ার মত কোথায় গিয়ে পড়ে কে জানে? ব্যারিস্টারি পরীক্ষার মাত্র আর দু মাস দেরী ছিল, হঠাৎ মজীদ জরুরী তার পেলে পিতার সাংঘাতিক অসুখ, তাকে ক'ল্‌কাতায় আস্‌তে হবে। সঙ্গে পথ খরচের টাকাও এসেছিল। বাপের একমাত্র ছেলে সে, ভগ্নীপতির উপরও বিশ্বাস নেই। মজীদ বাড়ী রওনা হওয়াই ঠিক কর্‌লে। ইংল্যাণ্ড থেকে তখন তাড়াতাড়ি কোন জাহাজ ছাড়্‌বার কথা ছিল না। তাই জেনোয়ায় এসে সে জাহাজ ধর্‌লে।

(৭)

ক'ল্‌কাতায় পৌঁছে সে সোজা গ্রেট ইস্‌টার্ণ হোটেলে গিয়ে উঠ্‌ল। বাড়ীতে তার অসুবিধা হবে, তাই একেবারে বাড়ী যাওয়াটা সে পছন্দ করে নি। আরও হয় ত কিছু কারণ থাক্‌তে পারে। সে হোটেলে বিশ্রাম ক'রে খাওয়া দাওয়া শেষ ক'রে বাড়ীতে বাপকে দেখ্‌তে এল। বাড়ীতে ঢুকেই সামনে বড় ভগ্নীকে দেখে দৌড়ে তাঁর গালে একটা চুমো দিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে "Where is father?" ভগ্নী ভায়ের চেহারা আর পোশাক পরিচ্ছদ দেখে, তার উপর তার মুখে ইংরেজি বুলি শুনে হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে রইল। মা ছেলের আসার শব্দে

পাগলিনীর মত দৌড়ে এসে তার গলা ধ'রে কাঁদতে লাগ্‌লেন। ক্রমে মজীদ জানতে পার্‌লে আজ পাঁচ দিন খান বাহাদুর সাহেব মারা গেছেন। মর্‌বার সময় তাঁর মুখের শেষ কথা ছিল "আঃ! বাবা মজীদ!"

(৮)

সকলের অনুরোধে মজীদ সাহেব ক'ল্‌কাতার বাড়ীতেই এখন থাকেন। তবে এখন বাড়ীর ভিতর বা'র সব বদলে গেছে। বাড়ী খানা চূনকাম ক'রে সাহেবী ধরণে সাজান হ'য়েছে। সমস্ত পুরানো চাকর বাকরের বদলে নতূন নতূন চাকর নিযুক্ত করা হ'য়েছে। সবাই হিন্দুস্তানি, কেবল খানসামাটা মগ। মা মগের হাতে খান না; কাজেই বাড়ীতে সাবেকের মধ্যে পীরুর মা ঝী আছে।

মজীদ সাহেব "সবুজ সমাজ" নামে একটা সভা স্থাপন ক'রেছেন। কাগজ পত্রে আছে সভার উদ্দেশ্য মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের আলো ঢুকিয়ে তাদের সকল রকমের উন্নতি সাধন করা। প্রত্যেক রবিবার মজীদ সাহেবের বৈঠকখানায় তার অধিবেশন হয়। "সবুজ সমাজ" নিয়ে মজীদ সাহেব বড় খাট্‌ছেন। তার জন্য প্রায়ই বাইরে বাইরে তাঁকে ঘুর্‌তে ফির্‌তে হয়। দিন রাত তাঁর অবসর নেই ব'ল্‌লেই হয়।

"সবুজ সমাজে"র রিপোর্ট ইংরেজি বাংলা কাগজে বা'র হয়। অল্প দিনের মধ্যে "সবুজ সমাজের" নাম হিন্দু মুসলমান সকলেরই মুখে শুন্‌তে পাওয়া যাচ্ছে। এই সময়ের মধ্যেই সমাজ যে সমস্ত প্রস্তাব পাশ ক'রেছে, তাতে দেশে বেশ একটা হুলস্থূল প'ড়ে গেছে। তার মধ্যে কয়েকটা হ'চ্ছে—বাল্য বিবাহ দূর করা, পর্দ্দা উঠান, মাদ্রাসা মক্তব বন্ধ করা, ভিক্ষা দণ্ডনীয় করা, সাহেবী পোশাক চালান, মোল্লা ধ্বংস করা, গান বাজ্‌না ও থিয়েটার প্রবর্ত্তন।

"সবুজ সমাজে"র এক বিশিষ্ট সভ্যের মুখে সভাপতি মজীদ সাহেবর আরও দুই একটী মন্তব্যের কথা শুনেছি, যা এখনও তিনি কয়েকজন সভ্যের অনুরোধে কোন কাগজে প্রকাশ করেন নি। তার মধ্যে হ'চ্ছে—(১) নমায রোযায় মুসলমান সমাজের দারিদ্র্য বাড়্‌ছে, অতএব তার সংস্কার আবশ্যক; (৩) খাদ্য ও পানীয় বিষয়ে হারাম হালাল্ ব'লে গোঁড়ামি করায়, মুসলমানগণের দিন দিন শারীরিক অবনতি হ'চ্ছে; অতএব সে সব শীঘ্র ছাড়া দরকার। "সবুজ সমাজের" সভ্যেরা এগুলি কাজে মেনে নিয়েছেন, তবে মজীদ সাহেব ছাড়া আর কেউ একটা বিশেষ মাংস খেতে এখনও রুচি ক'রে উঠ্‌তে পারেন নি। এগুলি কিন্তু এখনও একটু গোপনেই চল্‌ছে।

স্কুল কলেজের মুসলমান ছাত্র মহলে মজীদ সাহেবের এখন ষোল আনা পসার। মোল্লার দল যতই "সবুজ সমাজ" আর তার সভ্যদের ওপর কুফরি ফতোয়া বর্ষণ ক'র্‌ছে, ততই মজীদ সাহেবের প্রতিপত্তি বেড়ে চ'লেছে। বাস্তবিক মজীদ সাহেব তরুণদের কাছে এখম মুকুটবিহীন রাজা।

(৯)

মজীদ সাহেবের মা সেকেলে মেয়েমানুষ। তিনি ছেলের এ সমস্ত গৌরবের কোনই সন্ধান রাখেন না। অন্যদিকে ছেলে যে খ্রীষ্টান ধরণে থাকে, খায় দায় এবং আরও দুই চারিটা কথা পীরুর মার মুখে যা শুনেন, তার জন্য একান্ত দুঃখিত। মা বেটায় প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হয় না। কখনও দেখা হ'লে তিনি বলেন, "বাবা! যাই কর, মুসলমানি বজায় রেখো, নমায রোযা ছেড়ো না।" মজীদ সাহেব মাকে বুঝিয়ে দেন যে তুরকী, মিসর প্রভৃতি দেশের সব মুসলমান যে ভাবে চ'ল্‌ছে তিনিও সেইভাবে চ'ল্‌ছেন। মোল্লারা কেবল নিজের স্বার্থের জন্য আছে, আর তিনি দিন রাত মুসলমানদের ভালোর জন্য প্রাণপণে খাটছেন। মা বিয়ের কথা তুল্‌লে মজীদ সাহেব বলেন এখন তাঁর বিয়ে ক'রবার সময় নেই। বিশেষ তাঁর লায়েক মেয়ে কোথায়? তিনি নমায রোযায় বিশ্বাস করেন না কিংবা তিনি মোটেই

বিয়ে করবেন না—এ কথা ব'লে তিনি মাকে চটাতে চান না। কেউ বলে তার একটা মস্ত কারণ এই ছিল যে এই সময় মজীদ সাহেব মা বোনকে ফাঁকি দিয়ে তাঁদের অংশ গ্রাস কর্‌তে উকিলের সঙ্গে গোপনে মতলব আঁট্‌-ছিলেন। আমি মনে করি এসব তাঁর শত্রু পক্ষ মোল্লাদেরই রটান কথা।

ছেলের রাজি-নারাজিতে কি এসে যায়? মজীদ সাহেবের মা জামাইয়ের সাহায্যে চারিদিকে মেয়ের সন্ধান কর্‌তে লাগলেন। অবশেষে—নগরের জমিদারের একমাত্র মেয়ের সঙ্গে ছেলের সম্বন্ধ ঠিক কর্‌লেন। ভগ্নীপতির মুখে মজীদ সাহেব জান্‌তে পেলেন তাঁর ভাবিনী বধূ তার পিতার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। বয়স তের, রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। তের আর শ্যামবর্ণ—এই দুয়ে মজীদ সাহেবের আপত্তি ছিল; কিন্তু প্রকাণ্ড জমিদারি যখন বউয়ের সঙ্গে পাওয়া যাবে, তখন মজীদের মা ছেলের নিকট বিয়ের কথা পাড়্‌তেই একটু "না, না" করার পরেই মজীদ সাহেব রাজি হ'য়ে গেলেন।

"সবুজ সমাজে"র বন্ধুরা এই বাল্য বিবাহের কথা উঠালে মজীদ সাহেব বুঝাতে চেষ্টা ক'রলেন যে এর ভিতর একটা অর্থ আছে। বাইরের লোকে বুঝলে শুধু অর্থ। কিন্তু লোকের কথায় মজীদ সাহেবের কি এসে যায়?

(১০)

বিয়ে ক'ল্‌কাতাতেই হ'চ্ছে। কন্যা-পক্ষ একটা বড় বাড়ী ভাড়া নিয়েছেন। বিয়ের দিন ব্যাণ্ড বাজিয়ে বরযাত্রীর মটর গাড়ীর বহর দিয়ে ধুমধামের সঙ্গে মজীদ সাহেব বিয়ে বাড়ীতে এলেন। অভ্যর্থনা ও খাওয়া দাওয়া নবাবী কেতায় হ'ল। এখন বিয়ে পড়ান বাকী। বিশ হাজার টাকা দেন মোহর ঠিক হয়েছে, কাবীন নামাও লেখা হ'য়েছে। কন্যার পক্ষে উকীল ও সাক্ষী মজ্‌লিসে হাজির। মোল্লা সাহেব ও "শাদী" পড়াতে প্রস্তুত। এমন সময়ে সশব্দে একখানি মোটর গাড়ী বাড়ীর গেটে থাম্‌ল। ঝড় বেগে একজন মেম গাড়ীথেকে নেমে মজ্‌লিসে এসে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে তিনি তীব্র দৃষ্টিতে একবার সভার চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌লেন। তারপর বাঘের মত লাফ দিয়ে মজীদ সাহেবের সাম্‌নে গিয়ে তাঁর হাত ধ'রে এক টান দিয়ে বল্‌লেন "You have turned Musalman and are again going to marry! What nonsense! Come away!" (তুমি মুসলমান হ'য়েছ! আবার বিয়ে কর্‌তে যাচ্ছ! কি বোকামি! চলে এস)। মজীদ সাহেব মন্ত্রমুগ্ধের মত মেমের সঙ্গে সঙ্গে উঠ্‌লেন। মেম তাঁকে টেনে নিয়ে মোটরে বসিয়ে বিদ্যুদ্বেগে গাড়ী ছুটিয়ে দিলেন। সভার লোক

ভেবা চেকা মেরে তাকিয়ে রইল; সকলের মুখে এক কথা "এ কে? এ কি হ'ল?" যে মোল্লা সাহেব বিয়ে পড়াতে এসেছিলেন, তিনি মুচকে হেসে ব'ললেন, "আব কলাঈ খুল গয়ী।"

বেহেশ্‌তের পত্র

(১)

রহীম বখ্‌শ খাঁ পঞ্জাবী পাঠান। যুদ্ধই তাহার পৈতৃক পেশা। এবার তিন মাসের ছুটি পাইয়া সে বাড়ীতে আছে। কত শীঘ্র ছুটির দিনগুলি চলিয়া যাইতেছে। দিনগুলির কি ডানা আছে, না ছুটির সময়ে ঘড়ির কাঁটা ঘোড়ার মত ছুটিয়া যায়? তাই সে মধ্যে মধ্যে ভাবে।

ছুটির তখনও চারি সপ্তাহ বাকি। হঠাৎ সরকার হইতে জরুরি তার আসিল, তাহাকে সেই দিনই রওয়ানা হইতে হইবে। সে বুঝিল কোথায় লড়াই বাধিয়াছে, তাই এমন খাড়া তলব।

সে কতবার লড়াইতে গিয়াছে। দুএকবার জখমও হইয়াছে। এবারও. লড়াইতে যাইবে—তাহাতে আর দুঃখ কি? কিন্তু তার ছয় বছরের মেয়েটী আজ কিছুতেই তার কাছ ছাড়া হইতেছে না। পাঁচ কোশ পথ হাঁটিয়া রেলওয়ে স্টেশনে যাইতে হইবে, তিন ঘণ্টা মাত্র সময় আছে। তবুও মেয়েটা বাপকে ছাড়িতে চায় না। সে তাহার ছোট হাতের মুঠায় বাপের আঙ্গুল প্রাণপণে চাপিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কা'ল সে বাপকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আব্বাজান, তোমার আর কত দিন ছুটি আছে?" বাপ তাহার হাত পায়ের আঙ্গুল গণিয়া ফের আবার এক হাতের আঙ্গুল গণিয়া অপর হাতের মাঝখানের আঙ্গুল ধরিয়া বলিয়া ছিল, "এত দিন।" আজ আবার বাপ কেন যাইবে—রহীম মেয়েকে বুঝাইতে পারিল না। সে কতবার সম্মুখ যুদ্ধে সঙ্গীনের খোঁচায় শত্রুকে হটাইয়া দিয়াছে। কিন্তু আজ মেয়ের মুঠা হইতে সে তাহার আঙ্গুল টানিয়া লইতে পারিল না। সে আজ হার মানিয়াছে।

লড়াইয়ে সে কতবার শত্রুর লাইন ভেদ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। কখনও সে যুদ্ধে বুদ্ধিহারা হয় নাই। এখন কিন্তু সে কি করিবে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। তাহার মাথাটা আজ বড়ই গুলাইয়া যাইতে ছিল। এমন সময়ে তাহার স্ত্রী মেয়েকে জোর করিয়া কোলে তুলিয়া

লইল। মেয়েটী রাগে কাঁদিতে লাগিল। রহীম তাহাকে বুঝাইল, শীঘ্রই সে লড়াই হইতে ঘরে ফিরিবে এবং রোজ রোজ তার নামে একখানি চিঠী দিবে।

আর দাঁড়াইবার সময় ছিল না। রহীম বাহির হইয়া পড়িল। মেয়ে চেঁচাইয়া বলিল, "তবে আব্বাজান, জল্‌দি বাড়ী ফিরিবে ত?" রহীম শুধু বলিল, "হুঁ"। পিছন ফিরাইয়া তাকাইতে তাহার সাহস হইল না।

(২)

মেয়েটী বাড়ীর কাছের ডাকঘরে রোজই যায়, যদি তাহার বাপের পত্র আসিয়া থাকে। কোন দিন সে পত্র পায়, কোন দিন পায় না। যে দিন সে তাহার আব্বাজানের চিঠী পায়, সে দিন তার কি খুশী! সে তাহার বাপের চিঠী কিছুতেই কাছ ছাড়া করে না। শুইবার সময় বালিশের নীচে রাখিয়া শোয়। যে দিন ডাকঘরের মুন্‌শীজী বলেন, "না, তোমার বাপের চিঠী নাই।" সে দিন বেচারী মুখখানি কাল করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসে। সে খালি তার মাকে জিজ্ঞাসা করে, "আম্মাজান, বাপ রোজ চিঠী পাঠায় না কেন?" সে কি জানিবে যুদ্ধক্ষেত্রে সিপাহীকে কি রকম কাজ করিতে হয়।

দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে। এবার এক সপ্তাহ রহীমের আর কোন চিঠী পত্র নাই। মেয়েটা রোজ রোজ ডাকঘরে

গিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসে। তাহার সদা প্রফুল্ল মুখখানি বাদলার আকাশের মত মলিন গম্ভীর। এক সপ্তাহ পরে একখানি পত্র আসিল—রহীমের স্ত্রীর নামে। এত দিন পরে বাপের চিঠী! এ যেন রোজার পরে ঈদের নূতন চাঁদ। মেয়েটী হাসিতে হাসিতে দৌড়িয়া মায়ের কাছে আসিল। রহীমের স্ত্রী ত্রস্ত হইয়া পত্রখানি হাতে লইল। শিরোনামায় অন্যের হাতের লেখা দেখিয়া একটা অজানা ভয়ে তাহার বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল। স্বামী ছাড়া কেহ কখনও তাহাকে পত্র লেখে না। এ কাহার চিঠী? ইহাতে কিসের খবর? কম্পিত হস্তে লেফাফাখানা খুলিয়া সে যাহা পড়িল, তাহাতে যেন তাহার মাথায় বাজ পড়িল। সিপাহীর স্ত্রী হইলেও সে এত শীঘ্র ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে মাটির উপর বসিয়া পড়িল। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। সমস্ত সংসার যেন তাহার চক্ষের সম্মুখ হইতে মুছিয়া গিয়াছে। মেয়েটী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে ভাবিয়া উঠিতে পারিল না, পত্রে কি লেখা আছে। একটু পরে রহীমের স্ত্রী মেয়েকে বুকে টানিয়া লইয়া তাহাকে গাঢ়ভাবে বুকে চাপিয়া ধরিল। এতক্ষণ মেয়েটী সাহস করিয়া মাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই। এখন বলিল, "আম্মাজান, তুমি অমন কর কেন? আব্বাজান

কবে বাড়ী আসিবে ?” রহীমের স্ত্রীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সে কিছু বলিতে পারিল না। কেবল মেয়ের কপালে চুমা দিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

(৩)

মেয়েটী তবুও রোজ ডাকঘরে যায়। আর রোজই মলিন মুখে খালি হাতে ফিরিয়া আসে। একদিন সে তার নামে একখানি চিঠী পাইল। আজ সে কত খুশী। হাসিতে হাসিতে মাকে বলিল, “আম্মাজান, আব্বা আমাকে চিঠী লিখিয়াছে। আচ্ছা আম্মাজান, আব্বা এত দেরী করিয়া চিঠী লেখে কেন ? এবার আব্বা বাড়ী আসিলে আমি আর আব্বার কাছে যাইব না, রাগ করিয়া থাকিব।” মা পত্রখানি ধীরভাবে হাতে লইল। সে জানিত পত্রখানি কাহার লেখা। পত্রখানি মেয়েকে পড়িয়া শুনাইল—

বেহেশ্‌ত হইতে

জানের পেয়ারী, তারিখ—

তোমরা আমার বহুত বহুত দোআ জানিবে। আমি দুনিয়া ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছি। আমার লড়াই শেষ হইয়া গিয়াছে। এখানে আমার এক দোস্ত আছেন। তিনি আমাকে কত ভালবাসেন ! তিনি আমাকে ছাড়িয়া

দিতে চান না। আমি তোমাদের ওখানে গিয়া বা কি করিব? সেখানে কত কষ্ট, কত দুঃখ! এখানে কত সুখ, কত আনন্দ! পেয়ারী, এই আমার শেষ চিঠী। যদি তোমরা নেকবখ্ত হও, একদিন আমার কাছে আসিবে। এখানে আসিলে আর আমাদের ছাড়াছাড়ি হইবে না। আমরা সকলে গলায় গলায় আমাদের এই দোস্তের বাড়ীতে থাকিব। আমাদের কোনও ভাবনা চিন্তা দুঃখ কষ্ট থাকিবে না। আমি আরামে আছি। তোমাদের কোনও চিঠী লিখিবার দরকার নাই। আমি এখান হইতে তোমাদের সকল খবর পাইতেছি। ইতি

আশীর্ব্বাদক

রহীম বখ্শ খাঁ মরহূম মগ্ফূর।

মেয়ে সকল কথা বুঝিতে পারিল না। মা বুঝাইয়া দিল। মেয়ে যখন জানিল বাপ আর আসিবে না, তখন সে মায়ের চিবুকখানি ধরিয়া বলিল, 'আম্মাজান, আব্বা-জানকে আসিতে বল, আমি আর রাগ করিয়া থাকিব না।" মা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া চোখে হাত দিয়া রহিল।

লকখীছাড়া

শূন্য ঘরে রমযান চুপ ক'রে ব'সে আছে। তার সঙ্গে কোলের সেতারখানাও চুপ হ'য়ে আছে। সাঁঝের বাতি জ্বেলেই সে সেতার নিয়ে বসেছে; এখন রা'ত ১২টা বাজে। কিন্তু রমযানের সেদিকে আর খেয়াল নেই। সেতারখানা কোলেই আছে; কিন্তু মনে স্ফূর্ত্তি নেই, হাতে বল নেই। সে কয়েকবার তার একটা প্রিয় গান গাইতে চেষ্টা ক'র্লে; কিন্তু গলা ফুট্‌ল না। কেবল দু চোখ দিয়ে গরম জলের মৃদু ঝরণা ব'য়ে চল্‌ল।

গত জীবনের ছবিখানা একে একে তার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ছে। তার বাপ তালুকদার ছিলেন। জমিজমা টাকা কড়ি তাঁর মন্দ ছিল না। সে ছিল তার বাপের একই ছেলে। ছোট বেলায় তার মা মারা গিয়েছিলেন। বাপ তার লেখাপড়ার জন্য খুব চেষ্টা ক'রেছিলেন; কিন্তু লেখাপড়ায় তার মন ছিল না। সে শিখেছিল গান বাজনা আর উর্দ্দূ পারসী গযল। বাপের মর্‌বার পর সে গান বাজনায় এমন ডুবে গিয়েছিল, যে সংসারের দিকে একটুও মন দিতে পারে নি। জমি জমা সমস্ত বাকি খাজনার নিলামে বিক্রি হ'য়ে গেছে; নগদ টাকা কড়ি সবই খরচ হ'য়ে গেছে। কিছু লাখেরাজ জমি ছিল; তাই কষ্টে স্বষ্টে সংসার চল্‌ছে। কিন্তু কিছুতেই তার স্ফূর্ত্তি দমা'তে পারে নি। বুদ্ধিমান্ লোকে তার নাম দিয়েছিল লক্‌খীছাড়া।

ছোট বেলায় বাপ মা-মরা ছেলের বিয়ে দিয়ে পুতুলের মত একটী ছোট্ট বউ ঘরে এনে ছিলেন। রমযান তার দিকে কখনও ভাল নজরে তাকায় নি। জলের অভাবে যেমন লতা শুকিয়ে যায়, তেমনি ভালবাসার অভাবে বেচারীর দেহ মন ক্রমে ভেঙে পড়্‌ছিল। সে দিকে কিন্তু রমযানের লক্ষ্যই ছিল না। গান বাজনাই ছিল তার সব।

আজ দুপ'রে সেই উপেক্ষিতা স্ত্রীকে পৈতৃক গোর-

স্থানে চিরতরে শুইয়ে রেখে, রমযান ঘরে ফিরেছে। স্ত্রীর মৃত্যুর সময় সে কাঁদে নি। কিন্তু খালি ঘরে ঢুকে তার কান্না যেন ছাপিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। কপোত কপোতীর বিরহে যে ছট্‌ফট্‌ করে, কে ব'ল্‌বে সে ভালবাসার জন্য, কি সঙ্গহীনতার জন্য ?

*

* *

ভাব্‌তে ভাব্‌তে কখন যে রমযান ঘুমিয়ে প'ড়েছিল, তা সে জানে না। যখন ঘুম ভাঙ্‌ল, তখন অনেকটা বেলা হ'য়েছে। সেতারখানা তার পাশেই প'ড়ে আছে।

বিছানায় ব'সে ব'সে সে অনেক ক্ষণ ভাব্‌লে। পরে উঠে কাপড় চোপড় গোছাতে লাগ্‌ল। একটা ছোট চামড়ার ব্যাগে সেগুলি সে ভ'র্‌লে। ক্যাশ বাক্স খুলে দেখ্‌লে কয়েকটা টাকা মাত্র আছে। সে গুলি সে পকেটে নিলে। তারপর সেতারখানা একটা কেসে পুর্‌লে। ডা'ন হাতে ব্যাগ, বাঁ হাতে সেতারের কেস আর বগলে একটা ছাতা নিয়ে রমযান বাড়ী থেকে বেরুল।

দোরে তালা চাবি দিয়ে রমযান একবার বাড়ীর চারিদিকে ঘুর্‌ল। তারপর গোরস্তানে গিয়ে বাপ মার কবরের কাছে দাঁড়িয়ে তাঁদের আশীর্ব্বাদ চাইলে; স্ত্রীর

কবরের কাছে এসে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলে। তারপর খোলা দুনিয়ায় সে বেরিয়ে পড়্‌ল।

*

* *

রমযানের মন সংসারে বিরক্ত হ'য়ে গেছে। সে কোন পীরের কাছে মুরীদ হ'তে ইচ্ছা ক'রেছে। তাই পীর ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে সে কত জায়গায় বেড়িয়েছে। কিন্তু কই? মনের মত পীর পাওয়া গেল কোথায়? তবুও পীর পাওয়াই চাই। ঘুরে ঘুরে শেষে সে ঢাকায় এসে উপস্থিত। সে শুনেছিল সেখানে একজন কামেল পীর আছেন।

সেই দিনই আসরের নমাযের পর সে পীর সাহেবের মস্‌জিদে গেল। পীর সাহেব তখন সেখানে ছিলেন না। সন্ধান নিয়ে রমণার বনে গিয়ে সে তাঁর সাক্ষাৎ পেলে। (রমণা তখন জঙ্গল ছিল। সে আজ অনেক দিনের কথা।) তখন তিনি অশথ গাছের কচি পাতা ভেঙে কতকগুলি ছাগলের বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছিলেন। রমযানের সন্দেহ হ'ল ইনি কি পীর! সে থ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। পীর সাহেব তাকে কাছে ডাক্‌লেন।

পীর। বাবা, তুমি কি চাও?

রমযান। আপনি কি পীর সাহেব?

পীর। আমার নাম খাকছার আবদুল্লাহ্।

রমযান। আমি আপনার কাছে এসেছি।

পীর। তবে চল, বাসায় ফিরে যাই।

তিনি ছাগলগুলি সঙ্গে নিয়ে মস্‌জিদে ফির্‌লেন। মস্‌জিদের নীচের কুঠরীতে ছাগলগুলিকে বন্ধ ক'রে তিনি মস্‌জিদের হুজ্‌রায় বস্‌লেন। রমযান তাঁর কাছে নিজের জীবনের ইতিহাস ব'লে শেষে ব'ল্‌লে, সংসার আর তার ভাল লাগে না ; সে তওবা ক'রে মুরীদ হ'তে চায়।

পীর। বাবা, তুমি কখনও কাউকে ভালবেসেছ ?

রমযান নিরুত্তর। কিছুক্ষণ পরে সে বল্‌লে, "আমি ত মুরীদ হ'তে চাই।"

পীর। ঠিক। কিন্তু এই পথ ভালবাসার পথ। যে কখনও আল্লার সৃষ্টিকে ভালবাসে নি, সে আল্লাকে কেমন ক'রে ভালবাস্‌বে ? দেখাকে না চিন্‌লে কি অদেখাকে চেনা যায় ?

রমযান ভাব্‌তে লাগ্‌ল। শেষে বল্‌লে, "তবে কি আমার ফকীরি করা চল্‌বে না ?"

পীর। কেন চল্‌বে না ? যে আলেফ বে পড়ে, সেও পড়ে ; যে কোরান শরীফ পড়ে, সেও পড়ে। সৃষ্টিকে ভালবাস্‌তে আরম্ভ কর, এই হ'ল ফকীরির আলেফ বে। তার পর অন্য সবক নিও।

রমযান তখনই বিদায় নিতে চাচ্ছিল। কিন্তু পীর সাহেব তাকে রাত্রির খানা না খাইয়ে ছেড়ে দিলেন না। সেরাত্রি বোধ হয় পীর সাহেবের খাওয়া হয় নি।

বিদায়ের সময় পীর সাহেব রমযানের কাঁধে হাত রেখে বল্‌লেন, "বাবা, শেখ সা'দীর এই বয়েতটা মনে রেখ—

"তরীকৎ বজুয্‌ খিদ্‌মতে খল্‌ক নীস্ত।
ব তস্‌বীহ্‌ ও সজ্জাদা ও দল্‌ক নীস্ত॥
"সৃষ্টির সেবা ছাড়া সাধন পথ নেই।
সে পথ তস্‌বীহ্‌, জায় নমায ও ফকীরি কাঁথায় নেই।"

*

* *

সে বৎসর মক্কাশরীফে শুক্রবারে হজ্‌ হবার কথা। এই "আকবরী হজে" যোগ দিবার জন্য ইস্‌লামী দুনিয়ার চারিদিক্‌ থেকে দলে দলে ভক্তেরা রওনা হয়েছে। ঢাকার পীর সাহেব অনেক দিন থেকে জীবনের শেষ কর্ত্তব্য হজ্‌ ব্রত পালনের ইচ্ছায় ছিলেন। কিন্তু কখনও টাকা কড়ির যোগাড় ক'রে উঠ্‌তে পারেন নি। শুধু একবার তাঁর সমস্ত ছাগলের পাল বেচে কিছু টাকা সংগ্রহ ক'রেছিলেন। যাবারও সমস্ত আয়োজন শেষ ক'রেছিলেন।

কিন্তু সে বৎসর আকাল হওয়ায় তিনি সব টাকা খয়রাত ক'রে দিয়েছিলেন। তার পর অনেক. দিন থেকে তিনি হজের সংকল্প কর্‌ছিলেন ; কিন্তু তাঁর আর সম্বল হ'য়ে ওঠে না। এ বছর তিনি কয়েকজন মুরীদ নিয়ে হজে রওনা হ'য়েছেন। জীবন অস্তের দিকে চলেছে এবং সেবার আক্‌বরী হজ। তিনি খুব ব্যগ্র হ'য়েই হজে বেরিয়েছেন।

গোয়ালন্দে স্‌টীমার থেকে নেমে ট্রেনে উঠ্‌তে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ থেমে গেলেন। তাঁর কানে এল কে যেন "আল্লাহ্‌! আল্লাহ্‌!" ক'রে কাত্‌রাচ্ছে। লক্ষ্য ক'রে দেখ্‌লেন রেল লাইনের এক পাশে কে একজন কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে যন্ত্রণায় গোঁঙাচ্ছে। তিনি তার কাছে গিয়ে বস্‌লেন। তারপর বল্‌লেন, "বাবা! তুমি এমন ক'র্‌ছ কেন?" কয়েকবার জিজ্ঞাসার পর কথাটা যেন তার কানে গেল। সে ধীরে ধীরে বল্‌লে, "কে আপনি? সরে যান। আমি কুষ্ঠরোগী।" তবুও পীর সাহেব সেখানে বসে রইলেন। তিসি বল্‌লেন "বাবা! আমি ফকীর লোক। আমার ভয় নেই। বল বাবা! আমি তোমার কি ক'র্‌তে পারি।" রোগী বল্‌লে, "একটু পানি।" পীর সাহেব বদনার নল মুখের কাছে ধর্‌তে রোগী মুখের কাপড় সরা'ল। মুখ খানা রোগে কি ভীষণ

বিকৃত হ'য়ে গেছে! পীর সাহেব আস্তে আস্তে পানি তার মুখে ঢেলে দিলেন। রোগী একটু শান্ত হ'য়ে বল্‌লে, "এমন মেহেরবান, কে আপনি? আপনার গলার আওয়াজ যেন আমার চেনা।" পীর সাহেব বল্‌লেন, "আমি আব্দুল্লাহ্‌।" রোগী বড় আগ্রহে তাঁর দিকে অতি কষ্টে মুখ ফিরিয়ে বল্‌লে, "আঃ! আপনি ঢাকার পীর সাহেব। আমি রমযান।" তারপর ধীরে ধীরে সে তার কথা বল্‌লে। সে ছোটনাগপুরের একটা ছোট গ্রামে এক কুষ্ঠ আশ্রম ক'রে রোগীদের সেবা ক'রেছে আর তাদের ধর্ম্মের সান্ত্বনা দিয়েছে। তারপর তার কুষ্ঠ রোগ হওয়ায় সে পীর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সেখান থেকে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত এসেছে। রেলে ষ্টীমারে তাকে কেউ উঠ্‌তে দেয় নি; তাই সে পায়ে হেঁটেই এসেছে। কিন্তু পদ্মা তার পথ বন্ধ করায় সে এক মাস ধ'রে গোয়ালন্দে পড়ে আছে। মধ্যে রোগটাও খুব বেড়ে গেছে। তার জীবন সার্থক যে পীর সাহেবের সঙ্গে তার শেষ দেখা হ'ল।

এ দিকে ট্রেন ছাড়বার সময় হ'য়ে এসেছে। সঙ্গের শিষ্যেরা খুব ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লে, "হুজুর; শীগ্গির চলুন। এ গাড়ী ফেল হ'লে আর জাহাজ পাওয়া যাবে না।" পীর সাহেব ম্লান হাসি হেসে বল্‌লেন, "বাবা! তোমরা

যাও। আল্লাহ্ যদি আমার নসীবে হজ লিখে থাকেন, তা কখনও হবে।" এদিকে রেল ছাড়্বার ঘণ্টা পড়্ল। শিষ্যেরা দৌড়ে ট্রেনে গিয়ে উঠ্ল। বেশী কথা বল্বার সময় তখন ছিল না। কেবল পীর সাহেব আর তাঁর একজন শিষ্য রোগীর সেবার জন্য সেখানেই ব'সে রইলেন।

রাত্রের শেষে পীর সাহেব একবার রমযানকে জিজ্ঞাসা কর্লেন, "বাবা! তোমার কেমন বোধ হ'চ্ছে?" সে আস্তে আস্তে বল্লে,

"খবরম্ রসীদঃ ইম্‌শব্ কে নিগার্ খাহা আমদ্।
সরে মন্ ফিদাএ রাহে কে সওয়ার্ খাহা আমদ্।"

("আজ রাতে খবর এসেছে যে, বন্ধু, তুমি আস্‌বে। আমার মাথা তোমার পথে কুর্‌বানী হ'ক যেন তুমি সওয়ার হ'য়ে আস।")

* * * *

পর দিন পদ্মার ধার থেকে কিছু দূরে একটা নির্জ্জন জায়গায় রমযানকে কবর দিয়ে, পীর সাহেব স্নান ক'রে একটা হোটেলে এসে ব'স্লেন। সঙ্গের মুরীদটা মলিন মুখে ব'ল্লে, "হুজুর! তবে কি আমাদের আক্‌বরী হজ এবার হ'ল না?" পীর সাহেব চোখের পানি মুছ্‌তে মুছ্‌তে বল্লেন,

"দিল্ বদস্ত্ আওর্ কে হজ্জে আক্‌বরস্ত।
আয্ হযারাঁ কা'বা য়ক্ দিল্ বিহ্‌তরস্ত॥
কা'বা বুন্‌গাহে খলীলে আযরস্ত।
দিল্ গুযর্‌গাহে জলীলে আক্‌বরস্ত॥"

"লোকের দিল্ খুশী কর। এই হজ্জে আক্‌বর। হাজার কাবার চেয়ে এক দিল্ ভাল। কাবা আযরের পুত্র হয্‌রত ইব্রাহীম খলীলুল্লার (আল্লার বন্ধুর) তৈরী ঘর। আর দিল্ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আল্লার বেড়া'বার জায়গা।"

বিশ্বাসের মূল্য

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—বাগ্‌দাদ নগরের রাজপথ।

খলীফা হারুনুর রশীদ আজ খোশবাগে যাইতেছেন। সঙ্গে বেগম যোবেদা খাতুন। উভয় পার্শ্বে খোলা তলোয়ার হাতে খোজাগণ। রাজপথের দুই ধারে রাজপ্রাসাদ হইতে উপবন পর্য্যন্ত বসোরার সপুষ্প গোলাপ তরু সারি সারি সজ্জিত। গোলাপ বর্ণ মখমলে সমস্ত পথ মণ্ডিত। দক্ষিণ বামে গৃহেপ্রাচীরসমূহ গোলাপী রঙ্গে রঞ্জিত।

অগ্রে আরব্য ঘোটক পৃষ্ঠে খলীফা, পশ্চাৎ মহিষী। রাজাজ্ঞায় পথ জন-প্রাণি-শূন্য। কোথা হইতে পাগল বহ্‌লূল আসিল। বহ্‌লূল ধীরে ধীরে খলীফার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কেহ বলে বহ্‌লূল পাগল। কেহ বলে কামেল ফকীর। বিশেষতঃ রাজ-অন্তঃপুরে তাহার অব্যাহত গতি। কেহ বাধা দিল না। প্রধান শরীর-রক্ষক একবার খলীফার মুখের দিকে তাকাইল। খলীফা বলিলেন, "আসিতে দেও।"

বহ্‌লূল অগ্রসর হইয়া বলিল, "ওগো! বেহেশ্‌ত কিনিবে?

"কত দাম?"

"লাখ টাকা।"

"কই তোমার বেহেশ্‌ত?"

বহ্‌লূল কম্বলের ভিতর হইতে হিজি বিজি আঁকা একখানি মলিন কাগজ বাহির করিল।

খলীফা অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "যাও পাগল! এ তোমার পাগলামি করিবার সময় নয়।"

বহ্‌লূল সরিয়া গেল। কাগজখানি লইয়া বেগমের কাছে ধরিল। বেগম দ্বিরুক্তি না করিয়া গলা হইতে হীরার হার খুলিয়া বহ্‌লূলের হাতে দিলেন। বহ্‌লূল চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—বাগ্‌দাদের আদালত গৃহ।

সময়—সেইদিন মধ্যাহ্ন।

বাগ্‌দাদের আদালতে আর কখন বুঝি এত লোক জমে নাই। সকলেই প্রায় কাঙ্গাল গরীব। তাহারা এখানে কেন? এতক্ষণ ভিক্ষা করিলে তাহাদের দু'পয়সা রোজগার হইত। কিজন্য সকলে সজল নেত্রে বসিয়া আছে? আজ 'আলী হসন সওদাগরের বিচারের রায় প্রকাশিত হইবে। এমন দিন ছিল যখন প্রত্যেক বেলায় 'আলী হসনের দস্তরখানে হাজার লোক বসিত। দানের জন্য আজ 'আলী হসন ঋণী। দেনাও কম নয়, লাখ টাকা। শহরে এমন আমীর ওমরা, এমন গরীব দুঃখী ছিল না, যে একবার 'আলী হসনের পোলাও-কোর্ম্মার আস্বাদ গ্রহণ করে নাই। 'আলী হসনের ধনী বন্ধুগণ আজ কোথায়? অমন একটা অপব্যয়ী দেনাদার দেউলিয়ার সহিত সম্পর্ক রাখাটা লজ্জার কথা! তাই তাহারা কেহ আসে নাই। আসিয়াছে কেবল কতকগুলি লোক—যাহাদের হৃদয় ব্যতীত আর কোনও ধন নাই। তাহারা কি দিবে? দু'ফোঁটা চোখের জল বই ত নয়! দুনিয়ায় তাহার

মূল্য কি? কাযিয়ুল কোয্যাত রায় প্রকাশ করিলেন। দেনার দায়ে 'আলী হসনের কারাদণ্ড। গরীব দুঃখী হাহাকার করিয়া উঠিল।

জনতার মধ্য হইতে কে চীৎকার করিয়া বলিল, "দোহাই আল্লার! দণ্ড মা'ফ—আমি টাকা দিব।" সকলের নজর সেই দিকে গেল। এ যে বহ্‌লূল পাগল! 'আলী হসন খালাস।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—বাগ্‌দাদের রাজ অন্তঃপুরের একটি প্রকোষ্ঠ।

সময়—সেই দিন রাত্রি।

রাজপুরী কোলাহল-শূন্য। শয়ন-প্রকোষ্ঠে খলীফা ও মহিষী। অন্য কেহ নাই। স্বর্ণনির্ম্মিত শামা'দানে একটী কর্পূরের বাতি স্থির আলোক দিতেছে। এক কোণে একটী ভারতবর্ষজাত আগরের বাতি সুগন্ধ ছড়াইতেছে। খলীফা বলিতেছেন, "বেগম, তোমার মত নির্ব্বোধ ত দেখি নাই। কি বলিয়া তুমি লাখ টাকার হীরার হার দিয়া একটা পচা কাগজ কিনিলে!"

বেগম। জাহাঁপনা, আমি কাগজ কিনি নাই, বেহেশ্‌ত কিনিয়াছি।

খলীফা। বহ্‌লূল একটা পাগল! আর তুমি তারও বাড়া।

বেগম। হইতে পারে। আমি কিন্তু বহ্‌লূলকে সত্যবাদী বলিয়া জানি।

খলীফা। সে একটা মস্ত জুয়াচোর।

বেগম। সে যাহা হউক, আমি কিন্তু সরল বিশ্বাসে তাহাকে হার দিয়াছি। আল্লাহ্‌ আমার দিল্‌ দেখিবেন।

খলীফা! তোমাদের মেয়ে লোকের বুদ্ধিই এই প্রকার। আমি আর তোমার সহিত বৃথা বাক্য ব্যয় করিতে চাহি না।

কথোপকথন থামিল।

* * * * *

রাজপুরীতে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। রাজ্ঞী যোবেদা খাতূন আর নাই। খলীফাও কাঁদিতেছেন। তাঁহাকে সান্ত্বনা করে কে? মৃত দেহ সমাধিস্থ হইল। খলীফা বলিলেন, "কবর খোঁড়। আমি একবার রাণীর মুখখানি দেখিয়া লই।"

খলীফার আদেশ। কবর খোঁড়া হইল।

খলীফা কবরে নামিলেন। কিন্তু লাশ নাই। কবরে বড় এক সুড়ঙ্গ। তিনি সুড়ঙ্গ পথে চলিলেন।

কোথায় সুড়ঙ্গ? এ যে প্রশস্ত মাঠ! সেখানে অসংখ্য ফুলের গাছ। পাখীর মধুর কাকলীতে ঘাসগুলি পর্য্যন্ত যেন আনন্দ-হিল্লোলে নাচিতেছে। তাহার উপর আবার মৃদু মধুর সমীরণ। এমন ফুলগাছ, এমন বাতাস তিনি ত কখন দেখেন নাই, শুনেন নাই, অনুভব করেন নাই। কিন্তু তাঁহার চিত্তে আনন্দ কোথায়? যোবেদা যে নাই।

ক্রমে একটা বালাখানা। পৃথিবীর রাজা তিনি, তবুও সেই বালাখানার শোভা দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন।

ঐ যে যোবেদা! ঐ যে প্রাণের যোবেদা! জানালার নীচে দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন।

খলীফা আনন্দে দৌড়িয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে গেলেন। দরোয়ান বাধা দিল। খলীফার রাগ হইল। কিন্তু তিনি এখানে কে? অনুনয় করিয়া বলিলেন, "আমার সমস্ত রাজত্ব তোমাকে দিব, আমার বেগমের নিকটে আমাকে যাইতে দাও।" নিষ্ঠুর সে। তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। খলীফা কাঁদিয়া বলিলেন, "রাণী, তুমি আমায় ভিতরে লইয়া যাও।"

উত্তর হইল, "জাহাঁপনা! এই সেই আমার স্বর্গ, যাহা আমি হারের বদলে কিনিয়াছি। এখানে অন্যের আসিবার অধিকার নাই।"

খলীফা কাতর ভাবে কাঁদিয়া উঠিলেন। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল! পার্শ্বে রাণী নিদ্রা যাইতেছেন। মাথার বালিশ চোখের জলে ভিজিয়া গিয়াছে। খলীফা বলিয়া উঠিলেন, "লা-হওলা ওালা কু্উওতা ইল্লা বিল্লাহিল্ 'আলিয়িল্ 'আয্বীম্!" ※

তখন ভোর হইয়াছে। সিংহদরজায় নহবৎ বাজিতেছে। চারিদিকে সুস্বর পাখী গান করিতেছে। কর্পূরের বাতি নিভিয়া গিয়াছে। আগরের বাতি পুড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু তখনও একটা সুগন্ধ ঘরময় ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

খলীফা ডাকিলেন, "মস্রূর!"

"জাহাঁপনা! গোলাম হাজির।"

"যাও। বহ্লূলকে রাজসভায় লইয়া আইস।"

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—খলীফার দরবার।

সময়—পরদিন প্রাতঃকাল।

খলীফা সিংহাসনে বসিয়া আছেন। চারিদিকে উযীর নাযির উপবিষ্ট।

এমন সময় বহ্‌লূল আসিয়া উপস্থিত।

খলীফা বলিলেন, "এস বহ্‌লূল, এস, এখানে বস।"

বহ্‌লূল। কি গো! কি জন্য ডাকিয়াছ। গর্দ্দান লইবে নাকি? তোমাদের ত ঐ কাজ। হি-হি-হি।

খলীফা। না, বহ্‌লূল! তুমি বেহেশ্‌ত বিক্রয় করিবে?

বহ্‌লূল। না, গো না! তোমার বাদশাহী দিলেও না।

খলীফা। তবে কিসে পাওয়া যায়?

বহ্‌লূল। সরল বিশ্বাসে। আমি যাই।

(বহ্‌লূলের প্রস্থান)

---

* আরবী—"উন্নত মহান্ ঈশ্বর ব্যতীত কাহারও কোন অধিকার, কোন শক্তি নাই।" মুসলমানগণ দুঃস্বপ্ন দেখিলে কিংবা কোন অমঙ্গল ব্যাপার উপস্থিত হইলে ইহা বলিয়া থাকেন। হাই তুলিবার সময়েও ইহা উক্ত হইয়া থাকে।

রসবতী

বৈঠকখানায় ব'সে খবরের কাগজ পড়্‌ছি; মহাত্মা গান্ধী কি কর্‌ছেন, হিন্দু-মুসলমানে কোথায় দাঙ্গা হ'য়েছে, জল-প্লাবনে লোকের কিরূপ অবস্থা ঘ'টেছে, কোনও মানহানির মোকদ্দমায় আসামীর জেরার রিপোর্ট —এই রকম দরকারী বেদরকারী খবর নিয়ে মশ্‌গুল আছি, এমন সময়ে এক ছোকরা বাবু নমস্কার ক'রে ঘরে ঢুকলেন। খদ্দর পরা, নাকে চশ্‌মা আঁটা, পায় স্যাণ্ডেল্‌, হাতে বই কাগজ, দেখে মনে হ'ল বন্যার জন্যে চাঁদা নিতে এসেছেন।

তিনি। মশায়, আগামী পূজোর জন্যে আমাদের কাগজে আপনার একটা ছোট গল্প চাই।

আমি। ওঃ! আপনি কোন্ পত্রিকার?

তিনি। আজ্ঞে, আমি—পত্রিকার সহকারী সম্পাদক।

আমি। বেশ। তবে আমার কলমে তেমন গল্প জমে না। একটী ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখা আছে, যদি সেটা চান—

তিনি। মশায়, ওসব আমাদের কাগজে খাপ খাবে না। কোন গল্প টল্প—

আমি। ভাল কথা! একটা গল্প অনেক দিন হ'ল লিখে রেখেছি, তবে সেটা আপনাকে একবার শুনতে হবে।

তিনি। সানন্দে শুনব।

তখন আমি আমার পুরান ফাইল থেকে গল্পটা নিয়ে পড়্তে শুরু করলাম।—

রসবতী।

পাঁচু ছোট বেলায় বাপ-মা হারিয়েছে।

তিনি। মশায়, ক্ষমা করবেন। এই পাঁচু নামটা বদলে একটা ভাল নাম—যেমন ধরুন সুকুমার কি বিমল—

আমি। আচ্ছা, আগে আমার গল্পটা শেষ হ'ক, তারপর আপনার মন্তব্য বল্‌বেন।

পাঁচু ছোট বেলায় বাপ মা হারিয়েছে। পাড়া-গাঁয়ে তাদের বাড়ী ছিল; তাও পদ্মায় গ্রাস ক'রেছে। তাই সে শহরে তার মায়ের মাস্‌তুতো ভাই রমেশ মামার বাসায় আশ্রয় নিয়েছে।

রমেশ বাবু ওকালতি করেন। কেমন পশার তা জানি নে। তবে তিনি কাগজপত্র নিয়ে সকল সময়ই অত্যন্ত ব্যস্ত, তা কোনও মক্কেল আসুক বা না আসুক। রমেশ বাবু বড় হিসেবী লোক। বাসায় আগে একটা চাকর ছিল। পাঁচু আস্‌তে তার জবাব হ'ল। এখন বাজার করা, তামাক সাজা, এই সব ছোট খাঁট কাজ পাঁচুর জিম্মা।

পাঁচু স্থানীয় স্কুলের ক্লাস সেবেনে পড়ে। স্কুলে রোজ যায় আর মার খায়। বেচারা ঘরে পড়া তৈরির সময় পায় না। তবুও সে রোজ স্কুলে যায়।

স্কুলের পথে গোপাল ময়রার দোকান। দোকানের সাম্‌নে এসে পাঁচু একটু না দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারে না। লাল, গোলাপী, সাদা কত রঙের, কত নামের মিঠাই দোকানে থরে থরে সাজান থাকে। লোকে কিনে ঘরে নিয়ে যায়, কেউ পথে দাঁড়িয়ে খায়, কেউ

দোকানে ব'সে খায়। পাঁচু শুধু দেখে। তার মামা তাকে একদিনও একটা পয়সা দেন না, সে যে কিছু কেনে।

একদিন খুব সাহস ক'রে পাঁচু তার মামার কাছে একটা পয়সা চাইলে। অমনি তিরস্কার বর্ষণ হ'তে লাগ্‌ল। "হতভাগা, দু বেলা পেট ভ'রে ভাত খাও। পয়সা কি হবে? হাঁ, পয়সা নিয়ে বিড়ি পান খাবে, তা হবে না।"

পাঁচু দুবেলা দোকানের সাম্‌নে দিয়ে যায়, আর একটু দাঁড়ায়। ওই একটা রসে ভরা লাল রসগোল্লা পেলে সে কত খুশী হয়! ভদ্রলোকের ছেলে সে ত আর চাইতে পারে না। পয়সাও ত নেই।

একদিন বাসায় রাঁধ্‌তে দেরি হ'য়েছে। পাঁচু না খেয়েই স্কুলে এসেছে। ফিরবার পথে খিদেয় গা ঝিম্ ঝিম্ কর্‌ছে। সে সেই দোকানের সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। দোকানে কেউ নেই। লাল রসগোল্লাগুলি যেন তার দিকে চেয়ে বল্‌ছে "নে না ভাই! আমায় তোর গালে তুলে নে না।" পাঁচু আর থাক্‌তে পার্‌লে না। চারিদিকে একটু চেয়ে একটা বড় রসগোল্লা সাঁ ক'রে তুলে নিয়ে দৌড় দিলে।

আর একজন স্কুলের ছেলে, তার বন্ধু নরেন, সেও পিছু দৌড়ুল। কিছু দূর এসে নরেন পাঁচুকে ধ'রে ফেল্‌লে। "দে, ওটা আমাকে দে।" "কেন তোকে দেব ?" "বটে। মিঠাই চুরি ক'রেছিস। তোর মামাকে আর মাস্টারকে ব'লে তোকে মার খাওয়াব।" "যাক্ ভাই, তুই অর্দ্ধেকটা নে।" নরেন শুন্‌লে না। তার গায় জোর ছিল। সে পাঁচুর হাত থেকে মিঠাইটা কেড়ে গালে পুর্‌লে।

ওদিকে গোপাল ময়রা পিছন থেকে এসে নরেনের কান ধ'রে গালে এক থাপ্পড় লাগিয়ে দিলে। নরে-নের গাল থেকে রসগোল্লাটা প'ড়ে গেল। নরেন কাঁদো কাঁদো হ'য়ে ব'ল্লে, "কেন তুমি মার্‌লে ?"

"বদ্‌মাইশ ! মিঠাই চুরি ! ভদ্দর নোকের ছেলে হ'য়ে মিঠাই চুরি !"

"আমি চুরি করি নি। ও পাঁচু ক'রেছে।"

"কই সে ?"

কোন্ ফাঁকে পাঁচু স'রে পড়েছে, তা কেউ টের পায় নি। নরেন চারিদিকে চেয়ে ব'ল্লে "সে পালিয়েছে।"

গোপাল ময়রা সে কথা না শুনে তার হাত ধ'রে তাকে দোকান ঘরের দিকে হিড়্ হিড়্ ক'রে টেনে নিয়ে চল্‌ল। নরেন ব'ল্লে, "আঃ। আমাকে ধ'রে

নিয়ে যাচ্ছ কেন? আমি ত মিঠাই চুরি করি নি।” গোপাল কিন্তু নরেনকে টেনে নিয়েই চল্‌ল। পথে নরেন ব'ল্‌লে “তোমার মিঠায়ের দাম, বড় জোর, দু পয়সা। এই নেও, দু পয়সা; ছেড়ে দাও।” দোকান-দার তার হাত ছেড়ে দিলে। নরেন পকেটে হাত দিয়ে পয়সা খুঁজ্‌তে লাগ্‌ল। তারপর দোকানদারকে একটু অন্যমনস্ক দেখে একেবারে তীরের মত ছুট। গোপাল মোটা মানুষ। তার সঙ্গে দৌড়ে পার্‌বে কেন? কিছু দূর গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে দোকানে ফিরে এল।

পরদিন গোপাল স্কুলে গিয়ে হেড্‌ মাস্টারের কাছে নালিশ কর্‌লে। তিনি নরেনকে খুঁজে বা'র কর্‌লেন। নরেন পাঁচুর ঘাড়ে দোষ চাপাতে চাইলে। কিন্তু হেড্‌ মাস্টার সূক্ষ্ম বিচার ক'রে ঠিক করলেন নরেনই দোষী। সে মিছামিছি পাঁচুর দোষ দিচ্ছে। তখন তিনি তাকে গাধার টুপি মাথায় পরিয়ে সমস্ত ক্লাস ঘুরিয়ে কয়েক ঘা বেত দিয়ে ছেড়ে দিলেন।

সহকারী সম্পাদক। আপনার গল্প শেষ হ'ল না কি?

আমি। হাঁ, এই শেষ।

সহঃ সম্পাদক একটু ঠোঁট বাঁকিয়ে বল্‌লেন, “এ গল্প চল্‌বে না। আজ কা'ল দু'জন নায়ক আর একটা নায়িকা না হ'লে গল্প পছন্দসই হয় না।”

আমি। গল্প ত কল্পনা বই আর কিছু নয়। তা মনে করুন গোপালের রসগোল্লা নিয়ে দুটো ছোকরার কাড়াকাড়ির বদলে গোপালের ষোল বছরের সুন্দরী রসিকা মেয়ে নিয়ে এই রকম একটা কিছু হ'লে—

সহঃ সম্পাদক। প্লটটা মন্দ হ'বে না; চল্‌তে পারে। আপনি একটু কেটে কুটে রসগোল্লার জায়গায় সুশীলা নাম দিয়ে,—ভাল কথা! পাঁচু নামটাও বদলাতে হবে—একটু নতুন ক'রে লিখে দিন না। বেশী বদ-লাতে হ'বে না। আমাদের পত্রিকার শেষ আড়াই পেজের ম্যাটার কম প'ড়ে গেছে। বেশ চলে যাবে।

আমি। মশায়, আমার ত অত সময় নেই। আপনি ইচ্ছা মত পরিবর্ত্তন ক'রে কাগজে বা'র ক'র্‌তে পারেন।

সহঃ সম্পাদক। আচ্ছা! তাই হবে। কাগজ চালাতে গেলে এমন অনেক কিছু করতে হয়।

* * * *

তারপর আমার গল্পটা যে আকারে পত্রিকায় প্রকাশ হ'য়েছিল, তা আপনারা অবশ্য দেখেছেন।

ভবিষ্যতের মানুষ

(বিজ্ঞানের খিচুড়ি)

ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবাই হ'ল জ্ঞানীর কাজ। পিঁপড়ে মৌমাছি পর্য্যন্ত যখন ভবিষ্যতের জন্য ব্যতিব্যস্ত, তখন মানুষের কথা বলাই বাহুল্য। ফকীর সন্ন্যাসী যে ঘর বাড়ী ছেড়ে আহার নিদ্রা ভুলে, পাহাড়ে জঙ্গলে চোক বুঁজে ব'সে থাকে, সেটা যদি নিতান্ত গঞ্জিকার কৃপায় না হয়, তবে বল্‌তে হ'বে ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে। সমস্ত জীব জন্তুর দুটো চোখ সামনে থাকবার মানে হ'ল ভবিষ্যতের দিকে যেন নজর থাকে। অতীতের ভাবনা ভেবে কোন লাভ নেই। পণ্ডিতেরা

ত বলে গেছেন "গতস্য শোচনা নাস্তি।" আর বর্ত্তমান সে ত নেই বল্‌লেই হয়। এই যেটা বর্ত্তমান, সেটা এই কথা বল্‌তে বল্‌তে অতীত হ'য়ে গেল। কাজেই নদীর তরঙ্গ গণা আর বর্ত্তমানের চিন্তা করা সমানই অনর্থক। ভবিষ্যৎটা হ'চ্ছে আসল জিনিস। সেটা কখন শেষ হয় না। তাই ভবিষ্যতের মানব কেমন হবে সেটা একবার ভেবে দেখা যা'ক।

ব'ল্‌ছি অতীতের ভাবনা ভেবে কোন লাভ নেই। কিন্তু অতীতকে অগ্রাহ্য করা চলে না। অতীত হ'চ্ছে বুনিয়াদ, আর ভবিষ্যৎ হ'চ্ছে উপরের গঠন। ভবিষ্যৎকে বুঝ্‌তে হ'লে অতীত দিয়েই বুঝ্‌তে হবে। ভবিষ্যতের মানুষ কেমন হবে জান্‌তে গেলে, মানুষের অতীত কাহিনী একটু আলোচনা করা দরকার।

আজকাল প্রমাণ ছাড়া কেউ কোন কথা শুনতে চান না। কিন্তু প্রমাণ যে কোন্ জিনিসটা, সেইটে হ'চ্ছে একটা মহাতর্কের বিষয়। কেউ ধর্ম্মের প্রমাণকে সবচেয়ে অভ্রান্ত ও অকাট্য প্রমাণ মনে করেন। কেউ বলেন, বিজ্ঞানের প্রমাণই সেরা প্রমাণ! তার উপর আর কোনও প্রমাণ নেই। এ ক্ষেত্রে আমার কথা এই যে, যখন এটা তারহীন টেলিগ্রাফ ও এয়ারো-প্লেন জেপেলিনের যুগ, তখন বিজ্ঞানেরই প্রমাণকেই

বড় আসন দিতে হ'বে। অন্য পক্ষে শাস্ত্রকে অমান্য কর্‌লে চল্‌বে না। যখন দরকার হবে তখন শাস্ত্রীয় প্রমাণও বিজ্ঞানের সহচর রূপে আস্‌বে। আমার এই নিবন্ধে আমি দুকূল রক্ষা ক'রে চল্‌তেই চেষ্টা ক'রব। এখন

সুবর্ণসদৃশং পুষ্পং ফলে রত্নং ভবিষ্যতি।
আশয়া সেবিতস্তরুঃ ফলেন ঝন্‌ঝনায়তে ॥

না হ'লেই বাঁচি।

অতীত যুগের অর্থাৎ বহু কোটি বৎসরের আগে মানুষ ছিল কেমন? বিজ্ঞান বলে, ওরাংওটান বা শিমপাঞ্জী শ্রেণীর এক রকম জীব। সমস্ত গায়ে বড় বড় লোম। হাত দুটো প্রায় পায়ের সমান লম্বা। গাছের ডাল কিংবা পাহাড়ের গর্ত্ত বাসস্থান। ফলমূল পাতা প্রধান আহার। আঃ উঃ হাঃ এই ধরণের শব্দ গুলিই ভাষা। হাত পায়ের ইশারা অনেক সময় ভাষার অভাব দূর করে। এই রকম এক জীব ছিল মানুষের পূর্ব্বপুরুষ। এই হ'ল বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত।

এর শাস্ত্রীয় প্রমাণও আছে। রামায়ণে আছে, ত্রেতা যুগে রামচন্দ্র বানর-সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ ক'রেছিলেন। এখানকার পণ্ডিতেরা বলেন, বানর কি, না অসভ্য জাতি। আমি সে কথা শুনতে চাই নে। যখন সেই

সকল বানরের লেজের কথা রামায়ণে মহর্ষি বাল্মীকি স্পষ্ট ক'রে ব'লে গেছেন, তখন সেটা অস্বীকার করা চলে না। তা হ'লে রামায়ণ থেকে প্রমাণ হ'ল যে, বিজ্ঞানের নরপিতাই ক্রমে সভ্য হয়ে ত্রেতাযুগে দু' পায়ে হাঁটতে আর কথা বল্‌তে শিখেছিল, যদিও লেজটা তখনও সমূলে বিনষ্ট হয় নি।

দেখুন প্রথমে আমরা ছেলেপুলেদিগকে একটু দুরন্ত দেখিলে বলি, ছোঁড়াটা একেবারে বাঁদর। তখন আমরা অবশ্য ভাবি না যে, আমরা পূর্ব্বপুরুষেরই নাম কীর্ত্তন কর্‌ছি। সাহেবরাও অনেক সময়ে পূর্ব্বপুরুষের নামে আমাদিগকে আদর ক'রে 'বান্দর লোগ' ব'লে থাকেন।

আরও কতকগুলি মূল্যবান প্রমাণ আমি সংগ্রহ ক'রেছি। তবে য়ুরোপ আমেরিকার কোন্ জর্ণালে ছাপা হবে, বা জানাতে হবে, আজও তা নিশ্চয় কর্‌তে পারি নি। আর বাংলা কাগজে বেরুলে কেই বা বুঝবে, আর কেইবা আদর ক'রবে, ভেবে বাংলা কাগজে তা প্রকাশ করি নি। কারণ, উলুবনে মুক্ত ছড়ান বিজ্ঞদের নিষেধ। তবে আজ এই বিদ্বজ্জন-প্রপূরিত মজলিসে আপনাদের সামনে সেগুলি প্রকাশ করতে আমার কোনও আপত্তি নেই। . . .

দেখুন, আমরা নিতান্ত রাগ্‌লে বংশদণ্ড বা বংশশাখা ব্যবহার করি। ওরাংওটান নাকি রাগ্‌লে গাছের ডাল ভেঙে আততায়ীকে ছুড়ে ছুড়ে মারে। কোনও অস্ত্র না পেলে আমরা অন্ততঃপক্ষে আঁচ্‌ড়ে কাম্‌ড়ে দি। এটিও একটি বলবৎ প্রমাণ। তার পর দেখুন, আমরা ফরাশ, তাকিয়া, গদি ছেড়ে কাষ্ঠাসনের অধিক পক্ষপাতী। ইহাতে শাখা-মৃগের সহিত আমাদের একত্ব নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হয়। আরও দেখুন, আমরা ফলমূল বেশী পছন্দ করি। তার মধ্যে কদলী আবার অনেকের বিশেষ প্রিয়। বলুন এগুলি আমাদের বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ বিজ্ঞান-সম্মত (আজকাল ইক প্রত্যয় যোগে অনেক নতূন শব্দ হ'চ্ছে, যথা রাজনীতিক, সাহিত্যিক ইত্যাদি) পূর্ব্বপুরুষগণের আচারের পক্ষপাতিত্ব কিনা? তার পর সর্ব্বাপেক্ষা অকাট্য প্রমাণ এই যে, আমাদের আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণ ৫০ বৎসরের বেশী বয়স হ'লে বনে যেতেন। সেখানে গিয়ে ফল মূল পাতা খেয়ে কাটাতেন। পূর্ব্বপুরুষের প্রতি মমতাই যে এর একমাত্র কারণ, তা কে না বলবে? তা না হ'লে এমন সোনার ভারত ছেড়ে ভারচ্ছাড়া সাহেব সুবোরা 'হোম্‌ হোম সুইট হোম!!!' ব'লে কোথাকার

ঠাণ্ডা হিম-কন্‌কনে দেশের জন্য হাহুতাশ করেন! এখন বোধ হয় বুঝ্‌তে পারলেন, বক্তিয়ার খিলিজির মত কখনও কখনও কেউ যে আজানুলম্বিত বাহু হ'য়ে থাকে, সেটা অস্বাভাবিক নয়, বরং সেটা খুবই স্বাভাবিক।

মানবের পূর্ব্বপুরুষ সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ পেলেন। এখন ভবিষ্যতের মানুষ কেমন হবে, দেখা যা'ক, এই অতীতের মানুষ থেকে তার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় কি না। এটা বুঝ্‌তে গেলে একটু মাথা ঘামাবার দরকার হবে। প্রথমে দেখ্‌তে হবে, কিরূপে সেই চতুষ্পদ জীব এই জীবশ্রেষ্ঠ দ্বিপদ দ্বিহস্ত জীবে পরিণত হ'ল।

যখন আমাদের বৈজ্ঞানিক পূর্ব্বপুরুষগণ ডালে ডালে বাস ক'র্‌তেন, তখন হাত পা চারিটিরই বিশেষ দরকার হ'ত। মধ্যে মধ্যে লেজেরও আবশ্যকতা পড়ে যেত। তার পর যখন যুগ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গাছ পালা কম হ'য়ে গেল, যে গাছ পালা এখন কয়লা রূপে পরিণত হয়েছে, তখন তারা মাটিতেই চলা ফেরা ক'র্‌তে বাধ্য হ'ল। মাটিতে চল্‌তে চল্‌তে পা যেমন মজবুত ও মাংসল হ'য়ে এল, হাতও তেমনি সরু আর ছোট হ'য়ে গেল। লেজের দরকার না থাকায় সেটাও ছোট হ'য়ে গেল। তখন glacial period বরফ যুগ। সেই বরফের উপর ঘেঁস্‌ড়াতে ঘেঁস্‌ড়াতে

যেটুকু লেজ ছিল, সেটা একেবারে লোপ পেলে। তার পর শুকনা কাঠ ঘস্‌তে ঘস্‌তে যখন আগুন তৈরি ক'র্‌তে তারা শিখলে, আর আগুনে পুড়িয়ে ঝলসে খেতে আরম্ভ ক'র্‌লে, তখন দাঁতও সরু তীক্ষ্ণ থেকে ক্রমে চওড়া হ'য়ে গেল। তারপর শীত বর্ষা থেকে বাঁচবার জন্য যখন তারা গাছের ছাল বা জন্তুর চামড়া ব্যবহার ক'র্‌তে লাগ্‌ল, তখন লোমের আর দরকার থাক্‌ল না। কাজেই সেটা ছোট, সরু বা ক্রমে লুপ্ত হ'য়ে গেল। এই রকম ক'রে ক্রমে ক্রমে আমাদের এই সভ্য ভব্য জীবের আবির্ভাব হ'ল। এটা যে দুই এক হাজার বৎসরে হয়েছে তা নয়। বহু হাজার বৎসরে এই পরিবর্ত্তন হয়েছে। আপনারা দেখ্‌লেন, এই পরিবর্ত্তনের গোড়ায় হ'চ্ছে প্রকৃতির মিতব্যয়িতা। প্রকৃতি যখন দেখেন কোন জিনিসের দরকার নেই, ক্রমে ক্রমে সেটির অস্তিত্ব থাকে না। প্রকৃতিতে ফাজিল জিনিস একটিও দেখ্‌তে পাবেন না। আরও আপনারা দেখ্‌লেন, যখন যেটি আবশ্যক, প্রকৃতি তখন সেটি যোগাড় ক'রে দিতে বেশ মজবুত। আরও একটা জিনিস দেখ্‌বার বিষয় যে, প্রকৃতি তাড়াতাড়ি কোন জিনিস তৈরী করা মোটেই পছন্দ করেন না। প্রকৃতি সমস্তই ধীরে অথচ নিশ্চিত ভাবে ক'রে থাকেন।

এখন প্রকৃতির এই রীতি দেখে ভাবী কালের মানুষ কেমন হবে, অনুমান করা যাক।

কালিদাস না কি বাণীর মুখ থেকে বন্দনা আরম্ভ ক'রে ছিলেন, তাই কুস্থানে তাঁর অপঘাত মৃত্যু হয়। তাই আমি এই নর-দেবতার ভবিষ্যৎ মূর্ত্তি বর্ণনা কর্‌তে পা থেকেই শুরু ক'রব।

আগে লোকে দশ বিশ ক্রোশ অনায়াসে চ'লে যেত। তাদের পায়ের জোরও ছিল কম নয়। এখন পায়ে হাঁটা একটা নিতান্ত চাষাড়ে ব্যাপার; যার পয়সা নেই, সেই হাঁটে; ভাগ্যবান্ পুরুষ মাটিতে বড় একটা পা দেন না। যানের সংখ্যা দেখুন, ডাঙ্গায়—গোরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, রেলের গাড়ী, মোটর গাড়ী, দু-চাকার গাড়ী, তিন-চাকার গাড়ী, মোটর সাইকেল, ঘোড়া, উট, হাতী, খচ্চর, চমরী; জলে—নৌকা, স্টীমার, ভাসা জাহাজ, ডুবো জাহাজ; আকাশে—বাইপ্লেন, মনোপ্লেন, জেপিলিন। পরে আরও কত কি হবে। কাজেই পায়ের ব্যবহার না থাকায় পা শুকিয়ে গিয়ে, পরে ষাঁড়ের বাঁটের মত কিংবা ছাগলের গলার ঘুণ্টির মত দুটো নাম মাত্র জিনিস হ'য়ে থাক্‌বে।

এখন হাতের কথা। পূর্ব্বে যে সকল জিনিস হাতে গড়্‌তে হ'ত, এখন সে সব কলেই হ'চ্ছে। লাঙল চষা,

৫—

ধান কাটা, ধান ভানা, কাপড় বোনা, কাপড় কাচা, সূতা কাটা, সেলাই করা, লেখা,—এমন কি লোক খুন করা পর্য্যন্ত কলে হ'চ্ছে। কাজেই উর্দ্ধবাহু মুনির হাতের মত হাত দুটোও শুকিয়ে গিয়ে পায়ের দশা পাবে। তবে কল চালাবার জন্য হাতের আঙুল ক'টা খুব বড় আর জোরাল হবে।

এখন মুখ আর পেট। সমস্ত দুনিয়াটাকে চালাচ্চে কে? এর যদি খাঁটি তথ্য জানতে চান, তবে শুনুন। যদি এই পেট জিনিসটা না থাকত, তবে সংসার ক'র্‌বার এত ঝক্কি থাক্‌ত না। সংসারই থাক্‌ত না। সকলেই জ্ঞানী, গুণী, পরমধার্ম্মিক, যোগী ঋষি হ'য়ে যেত। পৃথিবীর যত বড় বড় লড়াই হয়েছে, তা' প্রায় পেট নিয়ে। দেখুন, সেই সত্য যুগের দেবাসুরের যুদ্ধ থেকে একালের য়ুরোপের হালের লড়াইয়ের গোড়ায় এই এক জিনিস। কিন্তু ভবিষ্যতের মানুষের পেট থাক্‌বে না, পেটের চিন্তাও থাক্‌বে না। খাওয়ার জন্য কত যোগাড় যন্ত্র! আবার সেই খাওয়াতেও কত ঝঞ্ঝাট—চিবাও, গেল, হজম কর, তারপর তার সার জিনিস শরীরে লাগাও, অসার জিনিস শরীরের দুই দোর দিয়ে ব'ার ক'রে ফেল! কত হাঙ্গামা! বিজ্ঞান এ সব হাঙ্গামা মিটিয়ে দেবে। শরীরের জন্য অম্লজান, উদ্‌জান প্রভৃতি যে কয়েকটি

জিনিসের দরকার, সব গুলিই বায়ুরূপে পাওয়া যেতে পারে। তখন গাল দিয়ে না খেয়ে, নাক দিয়ে নিশ্বাস টেনে নিলেই, শরীরের অভাব ঘুচে যাবে। আগেকার মুনিরা অনেকে বায়ুভক্ষক হ'য়ে থাকতেন; এখন আমরা বেশ বুঝতে পারছি, তাঁরা খাদ্যদ্রব্য বায়ুরূপে নাসিকার পথে সেবন করতেন। হাওয়া টেনে টেনে নাকের ছেঁদা দুটো যেমন ফনেলের মত বড় হ'য়ে যাবে, তেমনি পেটটা তুবড়ে তুবড়ে তোবড়ান লাউয়ের মত চুপসে যাবে। মুখের গহ্বর আর এত বড় থাকবে না। তবে আমরা ক্রমে যেমন বাক্যবাগীশ হ'য়ে পড়ছি, তাতে মুখ একেবারে বন্ধ করতে পারব না। তবে মুখটা কথা বলবার পক্ষেই থাকবে। সেটার আকার হবে—যেমন পারসী কবিরা তারিফ করেন—পেস্তার দানার মত।

এখন চোখ দুটো কেমন হবে দেখা যাক। আমাদের বাপ দাদারা চশমা কেমন জিনিস, অনেকেই হয়ত জানতেন না। আর তার দরকারও ছিল না। আমরা এখন দরকারে, বে-দরকারে চশমা ব্যবহার ক'রে চোখ-দুটোর এক রকম মাথাই খাচ্ছি। তারপর অণুবীক্ষণ দূরবীক্ষণে দেখতে গেলে চোখকে সঙ্কোচ করতে হয়। এই রকম ক'রে ক'রে কালে চোখ-দুটো ছোট হ'য়ে জ্যামিতির বিন্দুর আকার, না হয় তার চেয়ে কিছু বড় হ'য়ে থাকবে।

তবে মাথাটা হবে শরীরের সর্ব্বস্ব। একটা প্রকাণ্ড বিরাট জিনিস,—একটা জালাবিশেষ। মস্তিষ্কের কাজ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আগে লোকে বড় জোর পৃথিবীর কথাই ভাব্‌ত, এখন মঙ্গল গ্রহে লোক আছে কিনা, চাঁদের অপর পিঠে কি আছে, শুক্র গ্রহে লোক থাকা সম্ভব কিনা, এই সমস্ত দুনিয়া-ছাড়া বিষয় ভাব্‌তে আরম্ভ ক'রেছে। কাজেই চিন্তার বিষয় বেড়ে গিয়েছে। ভবিষ্যতে মস্তিষ্ক চর্চ্চা খুব বেশীই হবে। সেই জন্য মাথাটাও প্রকাণ্ড হ'য়ে যাবে।

আমি চিত্রকর নই, নচেৎ ভবিষ্যতের মানুষের একটি চিত্র আপনাদিগকে দিতে পার্‌তাম। এখন আপনাদিগকে একটা আভাস দিচ্ছি। ঐ যে পূর্ণিমার চাঁদ দেখেন, ঐটাকে খাসা কল্পনা ক'রে, যদি ত'াতে সরু দু'খানা পা, আর সরু দু'খানা হাত, আর হাতে প্রকাণ্ড কতকগুলি আঙুল কল্পনা কর্‌তে পারেন, তবে ভবিষ্যতের মানুষের ছবি কথঞ্চিৎ বুঝ্‌তে পার্‌বেন। যদি বলেন, ঐটার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ত শুন্‌লাম, এখন শাস্ত্রীয় প্রমাণ কোথায়? তবে আমি বলি—দেখুন সত্য যুগে মানুষ ছিল ২১ হাত, ত্রেতায় হ'ল ১৪ হাত, দ্বাপরে ৭ হাত। তা' হ'লে আমরা দেখ্‌ছি প্রত্যেক যুগে ৭ হাত ক'রে মানুষ কমে যাচ্ছে। এখন সোজা জমা খরচ—দ্বাপরে যদি ৭

হাত থাকে, তবে কলির শেষে অবশ্যই ৭ থেকে ৭ বাদ গেলে ০ থাকবে। মানুষ ঐ (০) শূন্যর মতনই হবে। কলিকালে ৩॥০ হাত মানবদেহের কথা যা বলা হ'য়েছে, তা কলির মাঝখানের কথা, শেষে কিন্তু শূন্যাকার। মাথাটা প্রকাণ্ড হবে, সুতরাং মানুষকে তখন শূন্যাকার দেখাবে কিনা, আর্য্য ঋষিরা সেটার ইঙ্গিত করে গেছেন। এখন যদি কারও এই বৈজ্ঞানিক বিবৃত্তি ভাল না লাগে, তবে তাঁকে করযোড়ে বলি—

নির্ম্মলয়সি ভুবনতলং
সততাক্ষিপ্তেব পরবলেন।
খলরসনে সম্মার্জ্জনি !
তদপি চ ভীতির্ভবৎস্পর্শেন ॥

গোরু চোর

(ফরাসী হইতে অনূদিত)

এক বছর ধ'রে হতভাগা য্যাক জেলখানার একটা ছোট কুঠ্‌রীতে বাস কর্‌ছে। কুঠ্‌রীটি পাহাড়ের গর্ত্তের মতন আঁধার। সেখানে ইঁদুর আর পাহারাদার ছাড়া কোন জ্যান্ত জীবের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় নি। পাহারাদার কিন্তু কখনো তার সঙ্গে কথাটি পর্য্যন্ত বল্‌ত না। তার নামে নালিশ হয়েছে কিনা, যদি বা হ'য়ে থাকে, তবে তার কসুর কি; সে তার কিছুই জান্‌ত না; জান্‌বারও কোনও উপায় ছিল না।

সে প্রায়ই নিজে নিজে বল্‌ত "আশ্চর্য্যি। এরা আমাকে এখানে আট্‌কে রেখেছে—কেউ ত বলে না কেন? এক এক বছর ধ'রে মোকদ্দমাটা যে কি তাও ত বুঝি নে। আমি যে একটা বড় রকম খারাপ কাজ ক'রে ফেলেছি তার আর সন্দেহ কি? কিন্তু সে কাজটি কি? আমি ত তন্ন তন্ন করে খুঁজ্‌লাম, জীবনের পাতা উল্‌টে দেখ্‌লাম, সর্ব্ব রকমে আমার কাজগুলি ভেবে দেখ্‌লাম—কিন্তু কই কিছুইত পেলাম না।......সত্যিই ত, আমি একটা গরীব মানুষ, বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই, কারুর উপর কোনও আড়িও নেই।...... হ'তে পারে আমি যা মনে করি ভাল কাজ কিংবা কোনও অন্যায় কাজ নয়, সেগুলিই মস্ত বড় খারাপ কাজ।......"

তার মনে এল একদিন সে একটা ছোট্ট ছেলেকে নদী থেকে ডুব্‌তে বাঁচিয়েছিল; আর একদিন তার নিজের খুব ক্ষিধে থাক্‌তেও সে পথের ধারের ক্ষিধেয় মর-মর এক হতভাগাকে তার সমস্ত রুটীগুলি দিয়ে দিয়েছিল।

সে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌লে "হয়ত তাই! হয়ত এগুলিই ভয়ানক অন্যায় কাজ!......কারণ, খুব ভয়ানক অন্যায় কিছু না কর্‌লে আমি কেন এ কুঠ্‌রীতে আট্‌কে আছি?......"

এই রকম চিন্তা তাকে কিছু সান্ত্বনা দিত; কারণ

তাতে অনিশ্চয়তার মধ্যে সে কিছু আলো পেত! তার বিশ্বাস, তার সম্বন্ধে আদালত বা হাকিমদের কোন ভুল হ'তে পারে না। তাঁরা যা' করেন, ঠিকই করেন।

যখন নতুন ক'রে তার কষ্ট মনে জেগে উঠ্‌ত সে নিজে নিজে আওড়াত "এ তাই! এ তাই!......সত্যিই এ তাই।...হ'তে পারে আরও কিছু যা' আমি জানিনে!... ......কারণ, আমি ত কিছুই জানিনে, অন্য কেউ না, আমিও না। আমি নেহাৎ গরীব, আমার কিছুই নেই; আমি কি ক'রে জান্‌ব কি ভাল কি মন্দ!......আমার মত গরীব লোকে যা করে সবই অন্যায়!......"

একদিন সকালে মনটাকে শক্ত ক'রে সাহসে বেঁধে তার পাহারাদারকে সে জিজ্ঞেস কর্‌লে।......পাহারা-দারের চেহারাটি ছিল ভীষণ, কিন্তু সে লোকটি ছিল ভাল। সে জওয়াব দিলে, "খোদার কসম! আমার মনে হয় তারা তোকে ভুলে গেছে।......"

বল্‌তে গিয়ে সে এক প্রচণ্ড হাসি হেসে উঠ্‌ল। হাসির চোটে তার প্রকাণ্ড গোঁফজোড়া উঁচু হ'য়ে উঠ্‌ল, যেমন দম্‌কা হাওয়ায় আধ-ভেজানো জান্‌লার পর্দ্দা উঁচু হ'য়ে উঠে।

"আছে একজন", সে আবার বল্‌তে লাগ্‌ল. "তার নম্বর ৮১৪; সে বাইস বৎসর এখানে হাজতে আছে!"

পাহারাদার বাড্সাইয়ের পাইপ রীতিমত পূরে দেশ্লাই ধরিয়ে আবার বল্তে লাগ্ল, "তুমি আর চাও কি ? এখন রাজ্যির লোকে জেল ভ'রে গেছে। হাকিমদেরই মাথা ঘুরে গিয়েছে, তাঁরা কি কর্বেন ঠিক কর্তে পার্ছেন না। ......জেলখানায় এবার বন্যা এসেছে !......"

য্যাক জিজ্ঞেস কর্লে, "ব্যাপারখানা কি বল ত ! কোনও 'গদর' (বিপ্লব) হয়েছে নাকি ?"

"বিপ্লবের চেয়ে সাঙ্ঘাতিক ।......একদল বেহায়া ডাকাতে ছোক্রা বেরিয়েছে, তারা রাস্তায় রাস্তায় সত্য ঘোষণা করে বেড়ায় ! তাদের যতই তাড়াতাড়ি বিচার কর আর যতই তাড়াতাড়ি জেলে পোরো সবই মিছে। এমন ব্যাপার রোজই হচ্ছে ! কেউ জানেনা কোত্থেকে এরা সব বেরুচ্ছে।......"

এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে সে আবার বল্লে "আঃ ! এসবের আখের বড়ই খারাপ !......"

কয়েদীর মনে একটা সন্দেহ এল। সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস কর্লে, "তবে আমিও কি না-জেনে না-শুনে রাস্তায় রাস্তায় সত্য ঘোষণা করেছি।"

পাহারাদার মাথা নেড়ে উত্তর দিলে "সে সম্ভব নয়।... তোর ত সে রকম ডাকাতে চেহারা নয়। তুই হয় ত' একটা খুনে, নয় একটা জালিয়াত, নয় একটা চোর।......

এ ত কিছুই নয়। সত্যি কি, এ ভালই।......কিন্তু তুই যা বল্‌লি সত্যিই যদি তা' ক'রে থাকিস্‌, তবে এদ্দিনে তোর বিচার হ'য়ে ফাঁসি কাঠে ঝুল্‌তিস্‌।......

"তবে যারা সত্য ঘোষণা করে, তাদের ফাঁসি কাঠেই ঝুল্‌তে হয়?"

"থাম্‌...সত্যিই...তা' সে মন্ত্রীই হ'ক আর বড় পাদ্রিই হ'ক......কিম্বা লড়াইয়ে বাহাদুরীর জন্য তগমাই পা'ক তাদেরও তাই ঘটবে।......হাঁ, তাই! ...যাবি কোথায়?"

ব্যাক একটু আশ্বস্ত হ'য়ে গুন্‌ গুন্‌ ক'রে বল্‌তে লাগ্‌ল, "তাই ত'!...আমি ত কিছু সত্য ঘোষণা করিনি।... সেটা দরকারি!" "ভাখ্‌ দেখি, তোর ত' কোন রাঙা গোরু নেই?...আজকালকার দিনে এটাও একটা অন্যায় জিনিস।"

পাহারাদার চ'লে গেল। ব্যাক ভাব্‌তে লাগল। "আমার তবে অস্থির হবার দরকার নেই।...আমি কখ্‌খনও সত্য ঘোষণা করিনি।...কখ্‌খনও আমার রাঙা গোরু ছিল না।...তবে আমার ভাবনা কি?"

সে রাত্রে সে আরামে ঘুমুল।

ব্যাকের গেরেফ্‌তারের এক বছর সতের দিন পরে দুইজন সেপাই তাকে নিয়ে আদালতে হাজির ক'র্‌লে। সেখানকার আলোয় সে বেহুঁশ হ'য়ে [illegible] গেল। ব্যাপারটা বড়ই সঙ্গীন হ'ল। হতভাগা অস্পষ্ট শুনতে

পেলে কতকগুলো লোক আস্তে আস্তে বল্‌ছে—"এ একটা বড় বদমায়েশ হ'বে।"

"এ একজন সত্য ঘোষণা ক'রেছে।"

"এর চেহারা দেখে মনে হয় এর একটা রাঙা গোরু আছে।"

"লোকের বিচারে একে সঁপে দিলেই ছিল ভাল।"

"ছাখো, লোকটা কেমন ফ্যাকাসে হ'য়ে গিয়েছে।"

"ফাঁসি,...ফাঁসি,...ফাঁসি... ।"

যখন য্যাকের হুঁশ হল, সে শুন্‌লে একটি যুবক বল্‌ছে, "কেন তোমরা তার বিরুদ্ধে চীৎকার করছ? তাকে গরীব আর কাতর দেখাচ্ছে।"

য্যাক দেখ্‌লে রাগে কয়েকটা মুখ বিকৃত হ'ল, কয়েকটা ঘুষি উঠ্‌ল।...যুবকটি মারের চোটে বেদম হ'য়ে রক্তাক্ত শরীরে দৌড়ে আদালতের কামরা থেকে বাইরে চল্‌ল। তার পিছে পিছে এক খুনে দলও ছুট্‌ল।

"ফাঁসি,...ফাঁসি,...ফাঁসি......"

আদালত ঘরে একটা টেবিলের সামনে কয়েকজন লোক ব'সে আছেন। তাদের পিছনে একখানি প্রকাণ্ড রক্তাক্ত যীশু খ্রীষ্টের ছবি। তাঁদের পরনে লাল পোষাক, মাথায় সোনালি টোপর।

সোনালি টোপরের নাচ থেকে একটা নাকি ভাঙা সুর

এল "য্যাক, তোমার কি বল্‌বার আছে?"

য্যাক কিছুমাত্র চঞ্চল না হ'য়ে ধীরে ধীরে উত্তর দিলে, "হুজুর, আমার রাঙা গোরু কি অ-রাঙা গোরু, কোথা থেকে থাক্‌বে? আমার না আছে গোরুর গোয়াল, না আছে গোরু-চরানোর মাঠ।"

বিচারক কড়া ধমক দিয়ে বল্‌লেন, "তুই জওয়াব এড়াচ্ছিস। তুই যে একটা নেহাৎ পাজি এবং জঘন্য প্রকৃতির লোক তা' তোর ভাবে বোঝা যাচ্ছে।......তোর নামে নালিশ হয় নি যে তোর গোয়াল আছে, কি তোর গোরু-চরানোর মাঠ আছে। সত্য বল্‌তে কি সেগুলি মস্ত অপরাধের বিষয় হ'লেও আদালত দয়া করে তোর বিরুদ্ধে সে সব নালিশ নিচ্ছেন না।...তোর নামে কেবল এই নালিশ হ'য়েছে যে তোর একটা রাঙা গোরু আছে। ...... বল্‌ তোর কি জওয়াব!"

হতভাগাটা আপত্তি ক'রে বল্‌লে, "হায়! আমার লাল রঙের গোরু নেই, অন্য রঙেরও কোনও গোরু নেই।... দুনিয়ার ওপর আমার নিজের বল্‌তে কিছুই নেই।...বাড়ার ভাগে আমি হলফ্‌ ক'রে বল্‌ছি আমার জীবনের কোনও সময় আমি কোনও সত্য ঘোষণা করি নি।"...

"বেশ।" বিচারক এমন ক'রে দাঁতে দাঁত পিষে বল্‌লেন যে, য্যাকের মনে হ'ল যেন তার জন্যে সারা জীবন

কয়েদের হুকুম হ'য়ে জেলখানার দোর বন্ধ হ'য়ে গেল।
"তোর ব্যাপার পরিষ্কার; তুই বস্‌তে পারিস্।"

সাঁঝের পরে কতকগুলো লোক যাদের য্যাক কোনও কালে চিন্‌ত না, তাদের ভিতর অনেক কথা কাটাকাটি হ'ল। কথার মধ্যে গালাগালির সঙ্গে সঙ্গে তার নাম ও রাঙা গোরু বার বার সে শুন্‌তে পেলে। তারপর রায় হ'ল, তার যা' নেই সেই রাঙা গোরু থাকার গুরুতর ও ভীষণ অপরাধের জন্য তার পঞ্চাশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

লোকের ভিড় দণ্ড শুনে নিরাশ হ'ল—এত গুরুপাপে এই লঘু দণ্ড!

"ফাঁসি...ফাঁসি...ফাঁসি......"

সেপাইরা অতি কষ্টে হতভাগাকে ভিড়ের হাত থেকে বাঁচালে। তাদের চীৎকার আর ভয় দেখানোর ভিতর থেকে সেপাইরা তাকে উদ্ধার ক'রে জেলখানায় তার কুঠ্‌রীতে নিয়ে এল। সেখানে পাহারাদার তার জন্য অপেক্ষা করছিল।

য্যাক একান্ত মুষ্‌ড়ে প'ড়ে বল্‌লে—"আমাকে খুন ক'রে ফেলেছে।......আমি ত কিছুই জানি নে। তুনিয়ায় আমার কিছুই নেই, তবে কেমন ক'রে আমার একটা রাঙা গোরু হ'ল!......"

পাহারাদার রাত্রের মত শেষ পাইপ সাজ্‌তে সাজ্‌তে বল্‌লে—"কেউ কখ্‌খনও জান্‌তে পারে না।......তুই জানিস্‌ নে কি ক'রে তোর একটা রাঙা গোরু হ'ল।...... আমি জানি নে কি ক'রে আমি জেলখানার পাহারাদার হ'লাম। লোকের ভিড়ও জানে না কেন তারা ফাঁসি ফাঁসি ব'লে চেঁচায়!...দুনিয়া যে ঘোরে তা' কি দুনিয়া জানে?" তারপর সে চুপ্‌টা ক'রে তার পাইপ টান্‌তে লাগ্‌ল।......

নষ্টচন্দ্র

(ফরাসী হইতে অনূদিত)

তারা মাটী ফুঁড়ে উঠ্‌ল—এক, দুই, তিন ক'রে ছ'জন—বৃষ্টির ও সাঁঝের বন্যার মধ্যে।

তারা জলের ভিতর থেকে বেরুল ব'ল্লেই হয়। বাস্তবিক একমাস ধ'রে এমন অনবরত বৃষ্টি হ'চ্ছিল, যে ঝোপ জঙ্গল সব ডুবে গেছে। দেবাঙ্গারোস ও আদ্রিয়ানোপলের চারিদিকে যে প্রান্তর, সেটা বৃষ্টিতে সমুদ্রের মতন দেখাচ্ছে!

গোধূলির হল্‌দে ধূলায় তাদের দেখাচ্ছিল যেন এক একজন এক কাঁড়ি ভেড়ার চামড়া। তার ভিতর থেকে ক্রিচের ডগাটা চক্‌ মক্‌ ক'রে উঠছিল। সকলের মাথায় প্রকাণ্ড অস্ত্রখানী টুপী—তার চাক্‌তিটা সবুজ।

এরা মাসিডোনিয়ার পাহারাদার সৈন্য; এখন বুলগেরিয়ার সৈন্য দলে কাজ করে। তারা লাইনের আগে যাচ্ছিল।

মধ্যে মধ্যে ঘোলাটে জলের ঘূর্ণী। তারা পা টিপে টিপে সাবধানে চ'ল্‌ছিল। তাদের প্রকাণ্ড দুখানা হাত বাতাসের যাঁতা কলের পাখার মত ন'ড়্‌ছিল। মধ্যে মধ্যে তারা ক্রুশের চিহ্ন ক'র্‌ছিল। হিংস্র জন্তুর মত তাদের প্রকাণ্ড ঘোলা চোখ চিরে তারা একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে তাদের কালো থোবনা ফিরিয়ে দেখ্‌ছিল। পঞ্চাশ পা দূরে একটা ডাল চক্‌চকে কাদায় পোতা ছিল। সেটী হেল্‌ছিল দুল্‌ছিল! মাসিডোনিয়ার সৈন্যেরা একটা ট্রেঞ্চের দিকে যাচ্ছিল। এই ডালটী ছিল তার সঙ্কেত চিহ্ন।

এই ট্রেঞ্চের এখন আর কোনও ব্যবহার নেই। সারজেণ্ট নারিচ আর তার পাঁচজন লোক তার ভিতর ঢুকে এই সঙ্কেত ক'রছিল। এই ছ'জন বুলগার সেই ছ'জন মাসিডোনিয়ার সৈন্যদের বন্ধু। দিপ্লোভিচ এবং কালুব অনেক দিনের পুরানো সঙ্গী। বুড়ো ডাকাত আলেক্‌সিস এক সময় নারিচের আইনের মাষ্টার ছিল। পোত্রোফ

আর রেফ নিকট আত্মীয়। তাদের প্রথম সাক্ষাতে নিজেদের পরিচয় দিতে দিতে তারা হাস্‌তে হাস্‌তে চোখের জল ফেলেছিল। সোলেমান আর নাজিফ আত্মীয়ের চেয়েও নিকট সম্পর্কীয় ছিল—তারা যাকে ভালবাস্‌ত, তার খুনের প্রতিহিংসা নিতে তারা দুজনেই প্রতিজ্ঞা ক'রেছিল।

অবরোধের গোড়া থেকেই এই বার জন সৈন্য রাত্রির অন্ধকারে এসে মিল্‌ত। তখন গোলা গুলি অন্ধ হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়ে; তাই তাদের সুযোগ ছিল।

তারা সেই পুরানো ট্রেঞ্চে এসে মিল্‌ল। সেটা এখন অকেজো ছিল। সেখানে কাদায় দাঁড়িয়ে একজন আর একজনের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াল। হিংস্র অথচ গম্ভীর মুখে তারা ভাই ভাইয়ের মত আলাপ করতে লাগ্‌ল। একজন ব'ল্লে, "লড়াইটে লম্বা হ'য়ে চল্‌ল।" আর একজন ব'ল্লে, "ভগবান্ করুন যেন তুর্কীদের সর্ব্বনাশ হয়।"

আর কোনও কথাবার্ত্তা নেই। বারজন লোক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নিঝুম হ'য়ে চিন্তা করতে লাগ্‌ল। তাদের মন ভার, মাথা ভারী। তারপর তারা বিদায় হ'য়ে দুই দল দুই পথ দিয়ে তাদের তাঁবুর দিকে রওনা হ'ল।

সে দিন সন্ধ্যায় এই সৈনিক বন্ধুরা তাদের মিলনের মাঝে কেমন যেন বিষণ্ণ ছিল! অনবরত বৃষ্টি, কন্‌কনে

ঠাণ্ডা, তার উপর এক রকম নতূন বিরক্তি আশ্চর্য্য রকমে তাদের কাবু ক'রে ফেলেছিল।

"লড়াই আর শেষ হবে না।" কালুব এই কথাগুলি এমন মুখ সিট্‌কে ব'ল্লে, যে তার বারুদের মত কালো মুখখানা একেবারে কুঁচ্‌কে গেল।

"কখ্‌খনই না," নাজিফ উত্তর ক'র্‌লে। সেই সঙ্গে সঙ্গে সে একটা নেকড়ে বাঘের মতন প্রকাণ্ড হাই তুল্‌লে।

তারা সকলে মাথা নীচু ক'রে একটু কাস্‌লে। যখন মন দুঃখে ভ'রে যায়, তখন তারা এ রকম করে। তারা একবার নীচে একবার উপরে নানা অদ্ভুত জিনিসের কথা ভাব্‌তে লাগ্‌ল।

কালুব ব'লে উঠ্‌ল, "চাঁদটা—শত্রুর নিশানের নতূন চাঁদের মতন দেখা যাচ্ছে।" কেউ যেমন গান করে এমন ভাবে তার গলার স্বরটা বদ্‌লে গেল।

"কুলক্ষণ!" বুড়ো ডাকাত আলেক্‌সিস ব'লে উঠ্‌ল—তার জীবন মরণের অভিজ্ঞতা অনেক হ'য়ে গেছে। "এ যে নষ্টচন্দ্র!"

নষ্টচন্দ্র যাদের উপর নজর দেয়, কেমন ক'রে তাদের সে কলে কৌশলে মারে—তার এক গল্প সে কর্‌লে।

তারা সকলেই মাথা তুলে মিট্ মিট্ ক'রে শোকের কাল কাপড়ে ঢাকা নতূন চাঁদের দিকে তাকা'ল।

"চাঁদের সঙ্গে ঠাট্টা কর্‌তে নেই," পোত্রোফ গলা ভার ক'রে ব'ল্লে। যদিও তার চুল সাদা হ'চ্ছিল, সে অল্প দিন হ'ল বিয়ে করেছে। "আমাদের সর্ব্বনাশ!"

"আমার ঘুম পেয়েছে," রেফ কচি ছেলের মত কাঁদো কাঁদো হ'য়ে ব'ল্‌লে।

"চল ফিরে যাই," আলেক্‌সিস রুক্ষ গলায় ব'লে উঠ্‌ল।

সে তার চামড়ার পোষাকে সঙ্গীনটা পুর্‌লে। মাসিডোনিয়ানদের কোমরবন্ধ ছিল না; তারা এই রকম ক'রে কাঠের ছুরি, কাঁটা আর, সঙ্গীন রাখ্‌ত।

এক এক ক'রে মাসিডোনিয়ার সৈন্যেরা বিদায় হ'ল। বুলগারেরা তাদের দিকে তাকিয়ে বিদায়ের জন্য দুঃখ ক'র্‌তে লাগ্‌ল। তারপর তারা সেখান থেকে না গিয়ে সেই খাতের মধ্যে র'য়ে গেল। নষ্ট চাঁদ দেখেছে ব'লে তাদের কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হ'চ্ছিল! তারপর শরীরটাও তাদের খুব ক্লান্ত ছিল। মনে কেমন একটা অজানা ভয় তাদের পেয়ে ব'সেছিল।

প্রত্যেকে যেন স্বপ্ন দেখ্‌ছিল। সারজেণ্ট নারিচ্ দেখ্‌ছিল তার ছোট বাড়ীটা। তাতে তার স্ত্রী ফুলের মালঞ্চের মত রঙ বেরঙের জমকালো পোষাকে রয়েছে। সে আরও দেখ্‌লে একটা গলির মোড়। সেখানে একটা

ছোট হাসি একটা সোনালী মাথার আসার কথা জানিয়ে দিচ্ছে। সে যেন গাছের বেড়ার গন্ধ টের পাচ্ছিল। সে চিনে ফেল্‌লে ছোট উইলো গাছগুলিকে যেগুলি ঝরণার পাশে একদল খাঁট লোকের মত দাঁড়িয়ে ছিল।

সে হঠাৎ মুখখানা ভার কর্‌লে, চোখ দুটো রগ্‌ড়ালে। সে ছায়া ছাড়া আর কিছু দেখ্‌তে পেলে না। সেই ছায়ার অপর দিকে নতূন চাঁদের চোখা ডগা তলোয়া-রের মতন ঝিক্ মিক্ ক'র্‌ছে।

সে চম্‌কে উঠ্‌ল। লোকে কি ভাব্‌ছে! তার যে দেরী হয়ে গেছে। ঐ বুঝি তাদের পিছু পিছু কর্ণেল এলেন তাড়াতাড়ি গট্‌মট্ ক'রে, আগুনের মত লাল সঞ্জাব দেওয়া খাকি পোষাক নাড়্‌তে নাড়্‌তে। খবরদার!

"চল, রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি।" তারা নড়্‌ল। হাই তুলে তুলে তাদের চোখ ছল্ ছল্ ক'র্‌ছিল। কিন্তু মুখখানা চিন্তায় কোঁচ্‌কান। তারা খাতের ভিতর হামাগুড়ি দিয়ে চল্‌ল।

তারা চ'লছে; চ'ল্‌ছেই। মুখের উপর বৃষ্টির মুখোস। তার ভিতর দিয়ে চোখ চিরে তারা দেখছে আর এক একবার আড়ে আড়ে চাঁদের দিকে তাকাচ্ছে।

ব্যাপার খানা কি? এখনও কোন শান্ত্রী নেই! তারা থম্‌কে দাঁড়াল। তারা পথ হারিয়ে ফেলেছে। দোষ

চাঁদের, তার আধা আলো, আধা আঁধারের। তাতে তারা ভুল করেছে। তাদের গা শিউরে উঠ্‌ল। তারা ফিরে চল্‌ল। পাঁকের ভিতর থেকে উঁচু ক'রে পা বার ক'রতে হচ্ছিল। তারা গর্ত্ত ডোবা সাবধানে এড়িয়ে চল্‌ছিল। আধ ঘণ্টা হ'ল অথচ কোনও আগুনই দেখা যায় না, কিছুই না।

তারা সেই প্রান্তরে তাদের গন্তব্য স্থান ভাল ক'রে ঠাওরাতে চেষ্টা করলে। তারা আবার নতুন ক'রে সাম্‌নে মাথা হেট ক'রে হন্‌হন্‌ ক'রে চল্‌ল।

হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ। সারজেণ্ট দিব্যি ক'রে উঠ্‌ল। সে এপাশ ওপাশ চাকার মতন ঘুর্‌তে লাগ্‌ল।

"আমরা তুর্কিদের লাইনে এসেছি!" অন্য সময় হ'লে এটা অসম্ভব ব'লে বোধ হ'ত। তারা অল্পক্ষণ হ'ল ট্রেঞ্চ ছেড়ে এসেছে। চাঁদের শত্রুতাই এই সব ব্যাপারের মূল! তারা মাথা নাড়্‌তে লাগল। কালুব রুক্ষভাবে ব'ল্লে, "আমাদের সকলের একই সময়ে তাঁবুতে ফেরা দরকার ছিল। মাসিডোনিয়ার লোক নাকে শুঁকে ঠিক পথ চিনে।"

তারা থম্‌কে দাঁড়াল।

"আঃ"! দিপ্লোভিচ হাঁপাতে হাঁপাতে ব'ল্লে। "শত্রু আমাদের জন্য ওত পেতে রয়েছে"।

মেঘের ফাঁক দিয়ে চাঁদের ঘোলা আলোয় তারা দেখ্‌লে—সাম্‌নে যেখানে গলার আওয়াজ যেতে পারে, এত দূরে একটা জঙ্গলের ধারে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে কতক গুলি সৈনিকের অস্পষ্ট ছায়ার মতন মূর্ত্তি।

একজন বুলগার একটা ভয়ানক দিব্যি ক'রে উঠ্‌ল।

এত দিন অপেক্ষা করার পরে লড়াইয়ের গন্ধ পেয়েছে ব'লে তারা আনন্দে চীৎকার করে উঠ্‌ত; কিন্তু অতি কষ্টে তারা থেমে গেল। চাঁদ তাদের শত্রুর গুপ্ত স্থানে নিয়ে এসেছে। তাতে আর সন্দেহ কি?

নারিচ চাপা গালায় গুলি চালাতে হুকুম দিলে। কিন্তু শত্রুই প্রথমে গুলি ছোড়া শুরু ক'র্‌লে। তারা যেন নারিচের কথা শুন্‌তে পেয়েছিল।

পোত্রোফ উহুঁ ক'রে উঠ্‌ল। লোকটা সবে বিয়ে ক'রে এসেছে। সে দু'হাতে পেট চেপে ধ'রে টল্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু সে মাথা নেড়ে জানালে তার কিছুই হয় নি।

দু দিক্ থেকে দুড়ুম্ দুড়ুম্ আওয়াজ হ'তে লাগ্‌ল। শীগ্গির তারা মাটীতে পড়্‌তে লাগ্‌ল। সকলের শেষে যে দাঁড়িয়েছিল, সে ঝুঁক্‌তে ঝুঁক্‌তে মাটীতে শুয়ে পড়্‌ল। তার যন্ত্রণার ঘোরে বোধ হ'ল যেন কিছু দূরে যারা তাকে খুন ক'রছে তাদের মধ্যে কেউ কাত্‌রাতে কাত্‌রাতে তার

নাম নিচ্ছে। মৃত্যুর ঘড়্‌ঘড়ানি দুই পক্ষ থেকে উঠ্‌ল, তারপর আস্তে আস্তে ক্ষীণ হ'য়ে এল, পরে গানের মত ধীরে ধীরে মিলে গেল।

একদল সন্ধানকারী সৈন্য লণ্ঠন দোলাতে দোলাতে সেখানে এসে হাজির। তখন সব ঠাণ্ডা, সব বোবা।

বারটা লাস। এখানে ছ'জন মাসিডোনিয়ান, সেখানে ছ'জন বুলগার। নষ্ট-চন্দ্রের কুসংস্কারে হতবুদ্ধি হ'য়ে তারা কেউ তাঁবুতে ফির্‌তে পারে নি; দুই দলের লোককে ছায়ার মত দেখা গিয়েছিল। তারা অন্ধের মত পরস্পরকে খুন কর্‌লে; তারা চিন্‌লে না, তারা জান্‌লে না যে তারা বন্ধু। তারা বুঝ্‌লে না যে তারা ভাই। লড়াইয়ে এমন হামেশাই হয়।

অন্ধ ক'নে

(রূপিকা)

(এক)

আজ আমার বিয়ে। মাটি যদি ফেটে যেত, তবে তার ভিতর লুকিয়ে লজ্জার হাত থেকে বেঁচে যেতুম। বিয়েয় আবার লজ্জা! হাঁ, আমার পক্ষে বটে। একে আমি গরীবের মেয়ে, তায় আবার অন্ধ, তার উপর কুৎসিত। শুনেছি যিনি আমার বর, তিনি খুব বুড়ো আর তাঁর নাকি অনেকগুলি পরিবারও আছে। তবে তিনি মস্ত জমিদার। সমস্ত ভবনগরের ষোল আনা মালিক। দয়া ক'রেই নাকি আমাকে বিয়ে কর্‌তে চেয়েছেন। বিয়ের আগে আমার মরণ হ'লে ভাল হ'ত। কিন্তু মরণকে যখন সাধা যায়, তখন তাকে পাওয়া যায় না। যখন কেউ তাকে চায় না, তখনই বুঝি সে আসে।

চিরদিনই আমি কিন্তু অন্ধ কুশ্রী ছিলুম না। একদিন ছিল, যখন সকলে রূপসী ব'লে আমার তারীফ্ কর'ত। আয়নার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি নিজেই নিজের রূপ দেখে আপনহারা হ'য়ে যেতুম। আমার রূপ-যৌবনের কথা শু'নে চারিদিক্ থেকে বিয়ের প্রস্তাব আস্‌ত। আমি সব প্রস্তাব দুর্গন্ধ ফুলের মত ছুড়ে ফেলে দিতুম। এমনই ছিল আমার রূপের গর্ব্ব! তারপর আমার উপর মা শীতলার কৃপা হ'ল। রূপ গেল। চোখ গেল। বোধ হয় চোখ দু'টা যাওয়া বিধাতার অনুগ্রহ। তা না হ'লে হয়ত আমি নিজেই নিজের চেহারা দেখে নিত্য মরমে মরে যেতুম।

শিলে ছেঁড়া পোকায় খাওয়া ফুলের কানের কাছে এসে আর কোনও মৌমাছি তার গুণ-গুঞ্জন করে না। আমার আর বর জোটে না। সেটা আমার বাপ মার কাছে নেহাত অস্বস্তির বিষয় হ'লেও আমার কাছে বড় স্বস্তির বিষয় ছিল। সইরা অনেক ক'রে বোঝালে—চিরকাল আইবুড়ো হ'য়ে থাক্‌লে কলঙ্ক হবে। মা কেঁদে ব'ল্‌লেন—তা হ'লে জা'ত যাবে। বাবা নিশ্বেস ফেলে ব'ল্‌লেন—একঘরে হ'য়ে থাক্‌তে হবে। কিন্তু বর কোথায়? শেষে নাকি ইনি দয়া ক'রে আমাকে গলায় তুল্‌তে (না, পায়ে রাখ্‌তে?) রাজি হয়েছেন। আজ

বিয়ের দিনের সকালে সব অতীত কথা মনের সাম্‌নে উজ্জ্বল হ'য়ে ভেসে আস্‌ছে। আর তাঁর দয়া আমাকে কৃতজ্ঞ না ক'রে আমার মরমের পরতায় পরতায় যেন বিষ মাখান সূচ ফোটাচ্ছে। আজ যদি চোখ থাকত্‌, একদিকে ছুটে পালাতুম।

বিয়ে বাড়ী। চারিদিকে হৈ চৈ। আমি কিন্তু একেলা। মাঝে মাঝে শানায়ের শাহানা রাগিণী কানে এসে লাগ্‌ছে। কিন্তু মনের কান্না বাজনার উপর ছাপিয়ে উঠ্‌ছে।

* * * *

(দুই)

সইদের ঠেলা ঠেলিতে জেগে উঠ্‌লুম। তারা কেবল বল্‌ছে—ওঠ্‌, ওঠ্‌, ওলো, তোর বর এসেছে। তারাই সাজিয়ে গুজিয়ে দিলে। হিপ্‌নোটাইয্‌ডের মত বিয়ের সমস্ত আচার শেষ ক'র্‌লুম। শুভ দর্শন হ'ল, কি অশুভ দর্শন হ'ল—তা জানি নে। আমি পলে পলে মরমে ম'রে যেতে লাগ্‌লুম।

* * * *

সইরা একে একে স'রে গেছে। বাসর ঘরে এখন আছি শুধু আমি আর তিনি। তাঁর গাল দিয়ে আমার গাল ছুঁয়ে আমার কানে কানে কি মধুর কথাগুলি

তিনি ব'ল্‌লেন! ম'রে যাই! এমন মন-কাড়া কথা আর কখন ত শুনি নি। কথার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সুগন্ধ মুখের হাওয়া আর নিশ্বেস আমাকে যেন মাতাল ক'রে তুল্‌ছিল। তাঁর পরশে আনন্দে অবশ হ'য়ে আমার সারা দেহে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ছিল।—তবে তিনি দয়া ক'রে আমার বিয়ে ক'র্‌তে চান নি। তিনি ছোটো বেলা থেকেই আমাকে ভালবেসে আসছেন। তবে প্রত্যাখ্যানের ভয়ে আমার সুসময়ে বিয়ের প্রস্তাব করেন নি। আমার দুর্দ্দিনে যখন সকলে স'রে গেছে, তিনি সাহস ক'রে আমাকে চেয়েছেন। তবে তিনি বুড়ো।—তা যাই হ'ক, আমি তাঁর দয়ার পাত্রী নই, আমি যথার্থ ই তাঁর প্রেমের পাত্রী। হায় রে! আজও আমার প্রেমিক আছে! আমার চোখ দিয়ে দর্ দর্ ক'রে গরম জল বেরুতে লাগ্‌ল।

আমার সমস্ত প্রাণ আমার অন্ধ চোখে এনে তাঁর পানে চাইলুম। এ কি? এ যে নবীন যুবক! এ কি? এ যে পরম সুন্দর! আমার চোখের ছানি কেটে গেছে? না, আমি স্বপ্ন দেখছি? আমি বল্‌লুম, "প্রিয়তম, তুমি এত নবীন!" তিনি বল্‌লেন "তোমার নবীনতা আমাকে নবীন করেছে।" আমি বল্‌লুম, "আমার জীবন-সর্ব্বস্ব, তুমি এত রূপবান্!" তিনি বল্‌লেন, "প্রিয়ে, তোমার রূপ আমাকে রূপবান্ ক'রেছে।" আমি কেঁদে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়্‌লুম;

বল'লুম, "আমার মাফ করো। আমি অতি কুৎসিত, তোমার চরণের দাসী হ'বার যোগ্য নই।" তিনি আবেগভরে আমাকে বুকে তুলে নিলেন; বল্‌লেন, "প্রিয়তমে, আজ থেকে তুমি আমার মাথার মণি হ'লে।'

———

বহুরূপী

(রূপিকা)

আধ ভেজান জানালার পাশে রোজই বসি। আর রোজই দেখি নীচের গলি দিয়ে কত লোকজন, কত গাড়ী ঘোড়া অবিরাম যায়। সেখানে বসি কেন? না ব'সে কোথায় যাব? সেয়ানা মেয়ে, তায় আইবুড় আবার পর্দ্দানশীন; মা আমাকে যে বেরুতে দেন না। তার উপর বাড়ীখানাও ছোট; আবার চারিদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। প্রাণটা যখন হাঁপিয়ে ওঠে, তখন জানালার পাশে এসে বসি। কিন্তু জানালাটা যে একেবারে খুলে বসব, সেটী হবার যো নেই; তা হ'লে বকুনির আর অন্ত থাকবে না।

যখন প্রথম দেশ থেকে বাবা এই শহরের বাসা বাড়ীতে নিয়ে আসেন, তখন কত দিন দানা পানি ছেড়ে কেবলই কেঁদেছি। এখনও সেই পাঁড়াগাঁয়ের গাছে ঢাকা ঠাণ্ডা বাড়ীখানার কথা আর খোলা প্রাণের কথা মনে হ'লে অজানায় দীর্ঘশ্বাস পড়ে, চোখে পানি ভ'রে আসে। হায় খোদা! কবে যে বাড়ী যাব! এখানকার ইট পাথর দেখে দেখে চোখ দুটো যে ঘোলা হবার মত হ'ল! বদ্ধ বাতাস গিলে গিলে প্রাণটা যে সারা হ'য়ে গেল।

গলি দিয়ে কত রকম পোশাকের কত লোক যায়। যে যার কাজে যায়। কাজের কি শেষ নেই? কত ভিখারী করুণ সুরে ভিখ্ মাঙ্তে যায়। কত ফেরিওয়ালা কত রকম ডাক ডেকে যায়। কত লোক পায়ে হেঁটে যায়। কত লোক গাড়ী ঘোড়া চ'ড়ে যায়। কেউ মাথা হেট ক'রে চলে। কেউ মাথা উঁচু ক'রে চলে। আমি ব'সে ব'সে দেখি।

এই অন্তহীন লোকের স্রোতের মাঝে আমি এক জনকে ধ'রে ফেলিছি। কখনও সে মহারাজ সাজে, কখনও সে কাঙাল বনে। কখনও সে হাত পেতে ভিখ্ মাঙে, কখনও সে দুই হাতে দান করে। কখনও সে বাবু, কখন সে মুটে। কখনও সে জোয়ান, কখনও সে বুড়ো। সে কি বহুরূপী? সে কখনও রাত্রে যায়, কখনও দিনে

যায়। তার সময় নেই, অসময় নেই। তাকে কিন্তু আমি ধ'রে ফেলেছি তার চোখ দেখে। সে সব লুকাতে পারে, পারে না তার ঢল্‌ঢলে ছল্‌ছলে চোখ দুটিকে লুকাতে।

তখন থেকে আমার নজর সেই বহুরূপীর ওপর। কখন সে যায়, কখন সে আসে—আমি তার আশায় বসে থাকি। আমার লক্ষ্য কেবল সকলের চোখের ওপর। এ ত সে নয়। হাঁ, এই সেই। এমন ক'রে কত দিন যায়।

আমি খুব ডাগর হ'য়ে উঠেছি। আমার বিয়ের জন্যে মায়ের ঘুম নেই। আচ্ছা, গরীবের মেয়ে এত শীগ্গির বেড়ে ওঠে কেন—তা তোমরা বল্‌তে পার? জানালার ধারে বসা আর বহুরূপীর সন্ধান করা আমার মস্ত বড় একটা বদ অভ্যাস জন্মে গেছে। তা না হ'লে মার এত গাল মন্দতেও আমি আজ সেই আধ-ভেজান জানালার পাশে ব'সে আছি!

নিশ্চয় সে আজ সারাদিন এ পথ দিয়ে যায় নি। গেলে নজরে না পড়ে যেত না। এই কথা মনে মনে ভাব্‌ছি, এমন সময় কানে আওয়াজ পড়্‌ল এক ফেরিওয়ালার। চেয়ে দেখলুম হাঁ, সেই ঢল্‌ঢলে ছল্‌ছলে চোখ—সেই বহুরূপী। দক্ষিণ বাতাসে জানালাটা হঠাৎ খুলে গেল। ছি! কি লজ্জার কথা। আজ চার চোখ এক

হ'ল। সে কি ডাকছিল "আমের আচার" না "আমায় চাই" আমি বুঝে উঠতে পারলুম না। ফেরিওয়ালাদের কথার ভঙ্গিই ও রকম। আমার মাথা ঘুরতে লাগল। তার পর কি হল জানি নে।

*　　*　　*　　*

এক দিন দেখি আমি রোগ শয্যায়। বাপ মা একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। এক বুড়ো কবিরাজ আমার পাশে বিছানায় ব'সে আমার নাড়ী দেখছেন। আমার শরীর শিউরে উঠ্‌ল। আমি আমার ক্ষীণ চোখ দুটি দিয়ে তাঁর মুখের পানে চাইলুম। আঃ! মরি! মরি! এই সে ঢল্‌ঢলে ছল্‌ছলে চোখ! এ যে সেই বহুরূপী! আমার মাথা ঘুরতে লাগ্‌ল। তিনি বল্‌লেন "ওষুধটা খেয়ে নাও, আমার লক্ষ্মীটী! সব সেরে যাবে।" আমি ঝোঁকের মাথায় ব'লে ফেল্‌লুম "না, আমি সার্‌তে চাই নে।" আমার বুকের ভিতর যেন আমার পরাণটী কেঁদে ব'ল্লে, "কেবল তোমাকে আমার পাশে পেতে চাই, হে আমার বৈদ্যরাজ!"

*　　*　　*　　*

অনেক দিন হ'য়ে গেছে। পাঠকপাঠিকারা, আমাকে তোমরা বেহায়া ভেব না। তিনিই আমার স্বামী।

গেরস্থের বৌ

(রূপিকা)

এক ছিল গেরস্থ। সে বিয়ে ক'রেছিল এক মরু দেশে। সে দেশে না আছে সবুজ ঘাস, না আছে শ্যামল গাছপালা; না আছে আকাশে মেঘ, না আছে মাটিতে রস। সে দেশে না আছে নদী আর তার কুলু কুলু নাদ; না আছে পাখী আর তার কল কল রব।

বিয়ের পর বৌ পয়লা গেরস্থের বাড়ীতে এল। এসে কতদিন সে মুখে লম্বা ঘোম্‌টা দিয়ে লাজে লজ্জাবতী লতাটীর মতন হ'য়ে রইল। বৌ চোখ বুঁজে কেবল কোণে ব'সে থাকে। বৌ চোখে কিছু দেখে না, কানে কিছু শোনে না। সকল সময় কেমন একটা ভয় ভয়। সকল সময় কেমন একটা জড়সড় ভাব।

ক্রমে তার সরম ভেঙে গেল। তখন বৌ চোখ মেলে দেখ্‌লে—বাঃ! এ দেশের মাটির ওপর কেমন ঘাসের নরম মখ্‌মল্! জমির ওপর কেমন গাছের ছোট বড় ছাতা! নীল আকাশের কোলে কেমন মেঘের পেঁজা তূলো! পাখীগুলো গান গেয়ে গান গেয়ে কেমন হাওয়ার ওপর সাঁতার দিয়ে বেড়ায়!

এক দিন পাড়ার মেয়েরা কলসী কাঁখে ক'রে তাকে এসে ব'ল্‌লে, "আয় না লো বৌ! জল আন্‌তে যাই।" তার বাপের বাড়ীর দেশে জল আন্‌তে যেত পুরুষ মানুষে, উট নিয়ে, ঘোড়া নিয়ে, কতদূর থেকে। এখানে মেয়েরা জল আন্‌তে যায় পায়ে হেঁটে! সে ত ভেবেই অস্থির। মেয়েরা তার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে গেল।

গেরস্থের বাড়ীর পিছনে একখানা ক্ষেত পার অশথ গাছের নীচে নদী। এত জল! কাকের চোখের মত কাল! আঃ! কি ঠাণ্ডা! কেমন কুল্ কুল্ ক'রে ব'য়ে

যাচ্ছে! জলে নেমে তার কাঁখের কল্সী কাঁখেই রইল, সে অবাক হ'য়ে নদীর দিকে তাকিয়ে রইল। কোথা থেকে কে এত জল ঢেলে দিলে! কোথায় এ জল যাচ্ছে? লোকে সব জল তুলে নিয়ে যাবে না ত? 'তা হ'লে ত নদী শুখিয়ে যাবে। সে জল নিয়ে ভাব্তে ভাব্তে বাড়ী ফির্ল।

একদিন গেরস্থ দেখে বাড়ীময় কেবল জলের কলসী আর জালা। রান্না ঘর থেকে নিয়ে শোবার ঘর, বৈঠকখানা, আঙিনা, সদর দরজা চারিদিকে কেবল জলের কলসী আর জালা। গেরস্থ বৌয়ের কাণ্ড দেখে অবাক! সে দূর থেকে বৌকে ডেকে বল্লে, "বলি ওগো! ব্যাপার খানা কি বল ত।" বৌ হেসে বল্লে, "কেন? জল তুলে রেখেছি। নদীর জল যদি ফুরিয়ে যায়, তাই। তুমি আমায় তেমন হাবা মেয়ে ভেব না।"

গেরস্থ হেসে বল্লে, "মরুদেশের মেয়ে তুমি, তোমায় কে হাবা বলে? কিন্তু তুমি ঘর বাড়ী এমন ক'রে জালা কলসীতে ভ'রে ফেলেছ, যে আমার একটু দাঁড়াবারও জায়গা রাখ নি। ও পাগলী! এ কৃপানদীর জল কি ফুরাবার?"

সমাপ্ত